GOVERNMENT OF INDIA.
IMPERIAL LIBRARY, CALCUTTA.

Class No. 182.9.B.

Book No. 883.54.

I. L. 38. Vol. 4

MGIPC—S2—XVI-3-3—29-4-47—5,000.

RARE BOOK
BENGAL LIBRARY 1880 CALCUTTA
NATIONAL LIBRARY No. Imp. 3961 DATE 2/05/09 CALCUTTA
IMP... LIBRARY ...JL. 09

সখা।
চতুর্থ ভাগ।
প্রথম সংখ্যা।

জানুয়ারি, ১৮৮৬।

চতুর্থ বর্ষ।

4680
182 CC 883.54

আমাদের "সখা" ঈশ্বর কৃপায় তিন বছর পার হইয়া চারি বছরে পা ল। কিন্তু এই বছরে "সখা" ইহার পরম বন্ধু, হার পিতা মাতাকে হারাইয়াছে। আমাদের দশে পিতৃ মাতৃহীন শিশুকে সকলে ভাল বাসে, কলেই বলে 'আহা! মাখেকো ছেলে, ওকে কেউ কছু বলিস্ নে।' এই বলিয়া পাড়ার সকল মেয়েরা তাকে আপনার ঘরে ডাকিয়া লইয়া যান; ার ঘরে যা কিছু মিষ্ট সামগ্রী থাকে একটু হাতে দন, হয়ত কোলে করিয়া তার মুখে একটী চুম্বন করেন। জগদীশ্বরের কি দয়া, সংসারে যে শিশু া হারা হয়, সে একটী মা হারাইয়া কত মা ায়! পাড়ার সকল মেয়ে তার মায়ের অভাব ূর্ণ করেন। পাড়ার ছেলেরাও তাকে কত যত্ন করে। খেলিতে খেলিতে কেহ তাহাকে মারিলে শটী ছেলে তাকে রক্ষা করিবার জন্য ছুটিয়া আসে। সকলেই বলে "আহা ওকে মারিস্ নে, ওর মা নেই।" আজ আমরা জগদীশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞ অন্তরে বলিতেছি যে আমাদের "সখা" পিতা মাতা হারাইয়া সকলের কাছে অধিক আদর পাইতেছে। আমরা প্রথমে ভাবিয়াছিলাম যে, যে প্রমদাচরণ "সখা"র জন্য দেহ মন প্রাণ সঁপে-ছিল, যে প্রমদাচরণ না খাইয়া ইহাকে খাওয়া-ইয়াছে, না পরিয়া ইহাকে পরাইয়াছে, ইহার জন্য শয্যায় পড়িয়া পড়িয়া ভাবিয়াছে, আহার নাই, নিদ্রা নাই, লোকের কাছে ছুটাছুটী করিয়াছে, নিজের অল্প আয়ে আপনি ক্লেশে থাকিয়া "সখা"কে ভাল করিবার জন্য চেষ্টা পাইয়াছে, ইহার জন্য ঈশ্বরের নিকট সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করিয়াছে, সেই প্রমদাচরণ যখন গেল, তখন শিশু "সখা"কে আর কে দেখিবে? হাজার হউক পরে কখনও মায়ের মত যত্ন করিতে পারে না। কিন্তু যতই দিন যাইতেছে আমাদের সে দুর্ভাবনা দূর হইতেছে। এখন দেখিতেছি দশ জনের উপকারের জন্য যার জন্ম হয়—সে ছেলেকে ঈশ্বর বাড়াইয়া থাকেন। দিন দিন তার উন্নতিই হয়। আমাদের "সখা"ও ঈশ্বর কৃপায় বাড়িতেছে। বাঙ্গলা দেশের বালক বালিকাদিগের উন্নতি সাধন করিবার জন্য "সখা"র জন্ম হইয়াছে। "সখা" গুরুর মত বালক বালিকাদিগের কাছে যায় না, কিন্তু বন্ধুর মত যায়। ছেলে হইয়া ছেলেদের সঙ্গে মিশে। আমরা "সখা"কে বলিয়া দিয়াছি যে, ছেলেরা যখন খেলা করিবে তখন "সখা" সেখানে যাইবে, যখন দশজন বালক বালিকা

একত্র বসিয়া গল্প করিবে, তখন সেখানে "সখা" যাইবে, ও বন্ধুভাবে কাছে বসিয়া ভাল কথা শুনাইবে। যাহাতে সকলের সুপথে মতি হয় এমন কথা শুনাইবে। "সখা" বালক বালিকাদের পরম উপকারী বন্ধু, এই জন্যই সকলে "সখা"কে এত ভাল বাসেন। পাড়ার দশটী ছেলের মধ্যে একটী ছেলে যদি সৎ হয়, যার সঙ্গে মিশিলে উপকার আছে, তবে বাড়ীর কর্ত্তারা বাড়ীর ছেলেদিগকে সেই ছেলের সঙ্গে মিশিতে দেন; এবং তাকে আদর করিয়া বাড়ীতে ডাকিয়া আনেন ও বলেন তুমি আমাদের বাড়ীতে সর্ব্বদা আসিবে ও আমাদের ছেলেদের সঙ্গে মিশিবে। দেশের ভদ্রলোকেরা সেইরূপ আমাদের "সখা"কে আদর করিয়া ডাকিয়া লইয়া গিয়াছেন এবং বলেছেন "ও 'সখা' তুমি আমাদের বাড়ীতে এস, ও 'সখা' তুমি আমাদের বাড়ীতে এস।" ছেলেদের ত কথাই নাই। তারা যেন "সখা"র পথ চাহিয়া থাকে, কখন "সখা" আসিবে। যেই "সখা" বাড়ীতে প্রবেশ করে, অমনি বাড়ী শুদ্ধ ছেলে "সখা"কে লইয়া কাড়াকাড়ি করে। এ বলে "সখা আমার" ও বলে "সখা আমার"। আমরা এই সকল বালক বালিকাকে বলিতেছি "সখা" তোমাদের সকলেরই। যদিও "সখা" আমাদের ঘরে জন্মিয়াছে, তবু এ "সখা" তোমাদেরই। "সখা" তোমাদের ভাই; তোমাদের উপকারের জন্যই "সখা"র জন্ম হইয়াছে। ঈশ্বর করুন যেন ইহার দ্বারা তোমাদের উপকার হয়।

আজ "সখা"র জন্ম দিন। ছেলেদের জন্ম দিনে বাড়ীতে সকলেই আনন্দ করে। কিন্তু আজ আমরা "সখা"কে বাহিরে যাইবার জন্য কাপড় পরাইতেছি, আর প্রমদাচরণের জন্য চক্ষের জল ফেলিতেছি। "সখা"র একটু আদর দেখিলে যে প্রমদাচরণ স্বর্গের চাঁদ হাতে পাইত, সেই প্রমদাচরণ আজ নাই। এখন যদি আমরা "সখা"কে ভাল করিয়া মানুষ করিতে পারি তবেই সে শোক নিবারণ হয়। অতএব পাঠক পাঠিকা তোমরা নূতন বছরে "সখা"কে সকলে আশীর্ব্বাদ কর, যেন "সখা" প্রমদাচরণের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে পারে।

অবশেষে যাঁহারা কৃপা করিয়া "সখা"তে লিখিয়াছেন, যাঁহারা ইহার উন্নতি বিষয়ে সাহায্য করিয়াছেন, যাঁহারা ইহার হইয়া অপরকে দুটো কথা বলিয়াছেন, যাঁহারা নিজ নিজ বাড়ীতে ইহাকে স্থান দিয়াছেন, যাঁহারা মনে মনে ইহার শুভ ইচ্ছা করিয়াছেন, সেই সকলকে অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাইয়া এবং যিনি সকল প্রকার শুভ সংকল্পের চির সহায়, সেই পরমেশ্বরের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিয়া আমরা নববর্ষে আবার শিশুদের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইতেছি।

রেড়ীর গাছ।

ঠিক পাঠিকাগণ! তোমরা রেড়ীর গাছ হয় ত দেখিয়াছ। এই রেড়ীর বিচি ঘানিতে বা কলে পিষিয়া যে তৈল বাহির হয় তাহাকেই আমরা সচরাচর রেড়ী বা ভেরেণ্ডার তৈল বলিয়া থাকি। রেড়ীর বিচি দুই প্রকার, ছোট ও বড়। ছোট বিচির তৈল

উৎকৃষ্ট ; ইহাই পরিষ্কার করিলে ইংরাজী চিকিৎসা শাস্ত্রে "কাষ্টর অইল" বলা হইয়া থাকে। লোকে এই তৈল জোলাপের জন্য খায়। বড় বিচি হইতে যে নিকৃষ্ট তৈল বাহির হয় তাহাই পোড়াইবার জন্য ব্যবহার হয়। কিন্তু রেড়ীর তৈল যে আরও কত প্রকার কাজে লাগে তাহা হয়ত অনেকে জানেন না। বিলাতে অনেক দোকানদার আছেন, তাঁহারা পরিষ্কার রেড়ীর তৈলের সহিত নানা প্রকার গন্ধ দ্রব্য মিশাইয়া মাথার চুলে লাগাইবার জন্য সুগন্ধি তৈল, সাবান ও পমেটম প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া থাকেন। আফ্রিকা দেশের নিগ্রো জাতি এই তৈলে রন্ধন করিয়া থাকে এবং আমাদের দেশে উড়ে জাতির অনেকেও গায়ে মাখিবার বা রন্ধন করিবার জন্য রেড়ীর তৈল ব্যবহার করে। রঙ্গীন বস্ত্রের রং উজ্জ্বল করিবার জন্য, ছিট কাপড়ের রং পাকা করিবার জন্য এবং "মরক্কো লেদার" নামক প্রসিদ্ধ ও মূল্যবান চামড়া প্রস্তুত করিবার জন্যও এই তৈল বিস্তর খরচ হয়। ইহা ভিন্ন কলের গাড়ি, কাপড়ের কল, বড় বড় কলের চাকা প্রভৃতি ভাল চলিবার জন্যও এই তৈল লাগান হয়। রেড়ীর গাছের আর একটী বিশেষ গুণ এই যে, যদি কোন ক্ষেত্রের চতুর্দ্দিকে এই গাছের বেড়া দেওয়া হয় তাহা হইলে তাহার শস্যে কখনও কোন প্রকার পোকা ধরে না। পৃথিবীর সকল স্থান অপেক্ষা ভারতবর্ষেই রেড়ীর চাষ অধিক, এই জন্য আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, রুষিয়া, ইতালি, ফ্রান্স, সিংহল, চীন, মরীচ ও অন্যান্য দ্বীপপুঞ্জে ভারতবর্ষ হইতে বৎসরে প্রায় ৩০।৩২ লক্ষ টাকার তৈল এবং ১১।১২ লক্ষ টাকার বিচি রপ্তানী হয়।

এতক্ষণ রেড়ীর বিচির তৈল সম্বন্ধেই অনেক কথা বলা হইল, কিন্তু তৈল ছাড়া আর একটী বিশেষ কাজের জন্য যে ভারতবর্ষে রেড়ীর চাষ হইয়া থাকে তাহা বলা হয় নাই। এই গাছ হইতে এক রকম মোটা ও মজবুত রেশম তৈয়ার হইয়া থাকে, উহাকে এরী এণ্ডী বা এরীণ্ডী রেশম বলে। আসাম দেশের অনেক স্থলে এবং বঙ্গদেশের কোন কোন জেলায় এইরূপ বিস্তর রেশম প্রস্তুত হয়। ইহাতে পরিবার কাপড়, গায়ের চাদর প্রভৃতি কত রকম কাপড় হয়। এরী সুতা এতদূর মজবুত যে একজন লোক একখানি এরী সূতার কাপড় আমরণ ব্যবহার করিয়াও ছিঁড়িতে পারে না। কিন্তু রেশম কেমন করিয়া জন্মে? পাঠক পাঠিকাগণ! পর পৃষ্ঠায় এই যে দুইটী সুন্দর পতঙ্গের ছবি দেখিতেছ ইহারাই এই রেশম প্রস্তুত করিয়া থাকে। এই পতঙ্গ কেমন করিয়া জন্মে তাহা কি জান? ভগবানের কেমন আশ্চর্য্য নিয়ম-কৌশলে ইহাদের জন্ম হয়, এবং ইহাদের জন্মাইবার উদ্দেশ্য কি তাহা পাঠ করিলে অবাক্ হইতে হয়!

যে দুইটী পতঙ্গের ছবি দেওয়া হইল ইহাদের একটী পুরুষ ও অপরটী স্ত্রী। স্ত্রীজাতীয়ের শরীরের আয়তন পুরুষদিগের অপেক্ষা কিছু বেশী। পশু, পক্ষী কিম্বা কীট মাত্রই যেমন জন্মাইবার পর তাহাদের নির্দ্দিষ্ট খাদ্য খায় এবং শাবক প্রসবের পরেও বাঁচিয়া থাকে এই পতঙ্গ দেহের গতি সেরূপ নয়। ইহারা জন্মিবার তিন চারি দিন পরে গাছের ডাল ও পাতায় কতকগুলি রাশীকৃত * ডিম পাড়িয়াই মরিয়া যায়। যে কয় দিন বাঁচে কোন খাদ্য খায় না। ডিমগুলি গাছের ডাল পালায় ছোট ছোট মুক্তার মত ঝুলিতে থাকে। এই ডিম হইতে ক্রমে খুব ছোট কৃমির আকারে এক

* এক একটী পতঙ্গের ডিম্বের সংখ্যা ৪০০ হইতে ৫০০।

রেড়ীর পতঙ্গ—পুং জাতীয়।

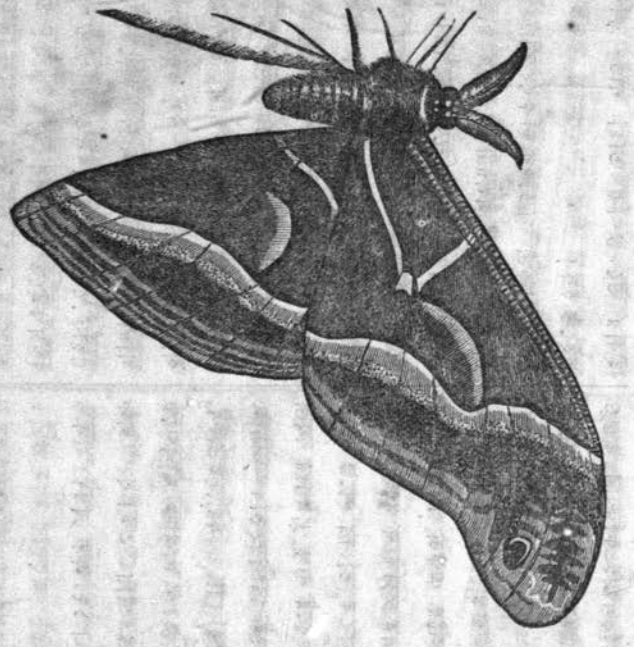

রেড়ীর পতঙ্গ—স্ত্রী জাতীয়।

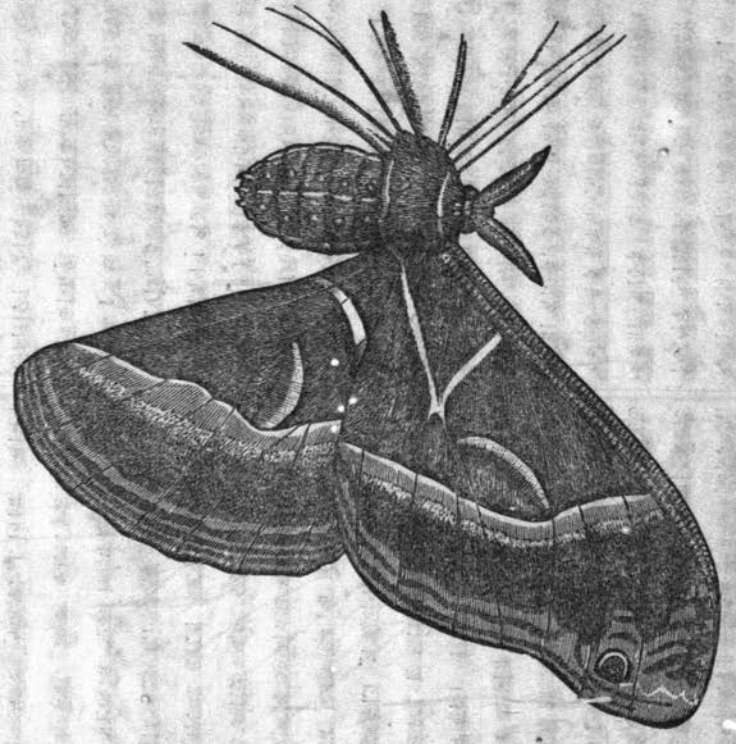

রকম পোকা বাহির হয়। প্রথম অবস্থায় পোকাগুলি দেখিতে খুব ছোট বটে, কিন্তু বড় হইলে এক একটী সাড়ে তিন ইঞ্চি পরিমাণ লম্বা হইয়া থাকে। ছোট পোকাগুলি ৪ বার খোলোষ ছাড়িবার পর তবে পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হয়। খোলোষ ছাড়িবার অর্থ কি জান? পোকাগুলি যেমন শীঘ্র শীঘ্র বাড়িতে থাকে তাহাদের গায়ের চামড়া তত শীঘ্র বাড়ে না, সুতরাং শরীরটা বড় আর শরীরের আবরণটা ছোট হইয়া আসিলেই আবরণটী আপনা আপনি ফাটিয়া যায়। বড় হওয়া পর্য্যন্ত পোকাগুলি কেবল পাতা খাইয়া বাঁচে। শেষ অবস্থায় অর্থাৎ চারিবার খোলোষ ছাড়িবার পর পঞ্চম বারে ইহাদের ক্ষুধা এত বাড়ে যে, তাহারা প্রথম অবস্থা হইতে চতুর্থ অবস্থা পর্য্যন্ত যতগুলি পাতা খায় এখন তাহার চারি গুণ পাতা খাইয়া ফেলে এবং এই খানেই তাহাদের খাওয়ার কার্য্য শেষ হয়। এখন ইহারা চুপ করিয়া এক জায়গায় বিশ্রাম করে। ইহাদের শরীরের উভয় পার্শ্বে ৯টী করিয়া ছিদ্র আছে। এক একটী ছিদ্রের কাছে একটী করিয়া গাঁটের মত ভাগ। ঐছিদ্র সকলের দ্বারা তাহাদের শ্বাস প্রশ্বাসের কার্য্য সম্পন্ন হয়। যাহা হউক পোকাগুলি বিশ্রাম করিবার অল্পক্ষণ পরেই মাকড়সার মত মুখের দুই দিক হইতে এক প্রকার লালা বাহির করিতে থাকে, যাহা বাতাস লাগিলেই সূক্ষ্ম কেশের মত সূতায় পরিণত হয় এবং দুই গাছি সূতা আঠাময় হওয়াতে পরস্পর যুক্ত হইয়া যায়। এই সূতাকেই আমরা রেশম বলিয়া থাকি। এক একটী পোকার মুখ হইতে এত লালা বাহির হয় যে, সূতা প্রস্তুত করিতে করিতে ক্রমে পোকাগুলি সেই সূতার মধ্যেই চাপা পড়ে। এই অবস্থার নাম গুটী। গুটীর মধ্যেই পোকাগুলির আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হয়। পূর্ব্ব পৃষ্ঠায় যে দুইটী সুন্দর পতঙ্গের ছবি দেখিয়াছ এই গুটীর মধ্যেই পরমেশ্বরের সৃষ্টিকৌশলে তাহাদের জন্ম হয়। একটী পোকা হইতে মনুষ্যের অগোচরে কেমন মেরুদণ্ড, পাখা ও পা যুক্ত এক পতঙ্গ জন্মায়! কিন্তু নির্দ্দয় মানুষের হাতে পড়িয়া কত লক্ষ লক্ষ পতঙ্গই না মারা যায়! গুটীর ভিতর পতঙ্গ দেহের অবয়ব পূর্ণ হইলেই উহারা মুখ হইতে আবার এক রকম লালা বাহির করে যাহা দ্বারা কঠিন গুটীর মুখের দিকটী নরম হইয়া আইসে এবং ঐ নরম দিকটী কাটিয়া তাহা হইতে পতঙ্গ বাহির হইয়া পড়ে; কিন্তু গুটী ভেদ করিয়া পতঙ্গ বাহির হইলে তাহা হইতে মানুষের পয়সা রোজকার ভাল রকম হয় না। ভেদ করা গুটী হইতে সূতা তুলিবার সময় লম্বা লম্বা সূতা না হইয়া টুকরা টুকরা সূতা বাহির হয়। এই জন্য নির্দ্দয় মানুষ পয়সা রোজকারের খাতিরে গুটী ভেদ করিবার পূর্ব্বে গুটীগুলিকে লইয়া মধ্যস্থিত প্রায় সমস্ত পতঙ্গের প্রাণ বিনষ্ট করে। পরে সূতা পাইবার জন্য কেবলমাত্র কতকগুলি গুটী যত্নে রক্ষা করে; এই হইতেই কালে পতঙ্গ বাহির হয় এবং আবার ডিম দিয়া মরিয়া যায়।

রেড়ীর পতঙ্গ দুই প্রকার, শাদা ও সবুজ। শাদা হইতে লাল এবং সবুজ হইতে শাদা রেশম তৈয়ার হয়। ইহাদের গুটীর আকার ঠিক একটী আমড়ার আঁটির মত। গুটীর বাহিরের সূতা $\frac{১}{১০০}$ ইঞ্চি এবং ভিতরের সূতা $\frac{১}{৩০০}$ ইঞ্চি মোটা। গুটীর উপরিভাগ খুব শক্ত,—সূতা সকল জমাট হইয়া থাকে,—এজন্য প্রথমে গুটীগুলাকে ক্ষারের জলে কিছুকাল ভিজাইয়া নরম করিতে হয় পরে হাতে করিয়া তুলা পিঁজার মত ইহা হইতে রেশম তুলিয়া চরকায় সূতা কাটিতে হয়। উত্তর আসামে এবং জৈন্তিয়া পাহাড়ে বিস্তর ভেরেণ্ডা

গাছ জন্মে এবং আসামে যত এরিণ্ডী রেশম জন্মায় এমন অপর কোথাও নয়। সেখানকার ধনী, মধ্যবিত্ত ও অসভ্য পাহাড়ী লোকদিগের অনেকেই এই সূতা ব্যবহার করে। রেড়ীর রেশমের সূতা লামঞ্জিষ্ঠা ও নীলবড়ি প্রভৃতি দ্বারা রং করিয়া সেই রঙ্গীন রেশম নানা প্রকার রেশমী কাপড়ের জন্য অথবা মোটা মোটা সূতার কাপড় বা চাদরের উপর ফুল কাটিবার জন্য খরচ হয়। বাঙ্গলা দেশের মধ্যে গয়া, চট্টগ্রাম, জলপাইগুড়ি, দার্জ্জিলিং, দিনাজপুর, পুরী, পূর্ণিয়া, রংপুর ও সাহাবাদ জেলা সকলেও অনেক রেড়ীর রেশম তৈয়ার হইয়া থাকে। ডিম ফুটিয়া কীটের জন্ম হইতে গুটি বাঁধা পর্য্যন্ত ৩০ দিনের অধিক সময় লাগে না সুতরাং রেড়ীর পতঙ্গ হইতে বৎসরে ১২ বার রেশম সংগ্রহ করা যাইতে পারে। এক সের রেশমী সূতার দাম ৸০ আনা হইতে ১৲ টাকা।

পাঠক পাঠিকাগণ! দেখ্‌লে ত, যে সামান্য গাছ বনে জঙ্গলে কত জন্মায়, যাহাকে অনাদর করে হয়ত কত লোকে নষ্ট করে তাহা হইতেই মানুষের কত উপকার হয়। এত দিন তোমরা হয়ত অনেকেই ভেরেণ্ডার তৈল ছাড়া গাছের আর কোন গুণ জানিতে না; বল দেখি আজ তোমরা সেই সামান্য গাছ সম্বন্ধে কত নূতন কথা শিখিলে! এইরূপে আমাদের খাওয়া পরা বা নিত্য খরচের এক একটী জিনিসের গুণাগুণ ভাল করিয়া জানিয়া রাখিলে তোমাদের জ্ঞান কেমন বৃদ্ধি হয় এবং ভবিষ্যতে তোমরা কত কাজের লোক হতে পার। পরমেশ্বর যাহা কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন সকলই আমাদের উপকারের জন্য। আমরা যে ঘাস পায়ে মাড়াইয়া চলিয়া যাই তাহা দ্বারা পৃথিবীর কত কল্যাণ সাধিত হয় একবার তাহা ভাবিলে কেনা আশ্চর্য্যান্বিত হয়?

বিদ্যাসাগর দয়ার সাগর।

ত বর্ষে আমরা তোমাদিগকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনচরিত কিছু বলিয়াছি। কিন্তু তাঁহার গুণের কথা সমুদয় বলা হয় নাই। যে গুণের জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় দেশে বিখ্যাত, সেটী দয়া। জগতের দীন দুঃখী, কাঙ্গাল, দরিদ্রদের বন্ধু এমন অল্পই আছে। জগতের দুঃখীদের দুঃখের কথা শুনিয়া কতবার যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চক্ষে জল পড়িতে দেখিয়াছি, তাহা তোমাদিগকে সংখ্যা করিয়া বলিতে পারি না।

অনেক দিন হইল আমাদের বাসাতে পাড়ার একটী বালিকা খেলিতে আসিত। মেয়েটীর বয়স তখন আট কি নয় বৎসর। মেয়েটী অতি সুশ্রী ছিল, তাহার মুখখানি এমন সুন্দর যে দেখিলেই ভাল বাসিতে হয়। তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় আমাদের বাসাতে মধ্যে মধ্যে বেড়াইতে আসিতেন। একদিন তিনি সেই বালিকাটীকে দেখিতে পাইলেন। দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন, "বাঃ বেশ মেয়েটী, কার মেয়ে হে!" আমরা বলি-

লাম "মহাশয় ওটী পাড়ার একটি নাপিতের মেয়ে। ওটী বিধবা।" যেই এই কথা বলা হইল, অমনি বিদ্যাসাগর মহাশয় যে এত হাসি খুসি আমোদ আহ্লাদ করিতেছিলেন, সে হাসি তাঁহার মুখ হইতে পলায়ন করিল; এবং আমরা দেখিলাম তাঁহার দুই চক্ষে দুইটী জলধারা গড়াইতেছে। তিনি মেয়েটীকে বলিলেন—"আয় মা আয়, আমার কাছে আয়," এই বলিয়া সেই নাপিতের মেয়েটীকে নিজ কোলে বসাইলেন, ও অশ্রুপূর্ণ নয়নে তাহার মুখে চুম্বন করিতে লাগিলেন। আমরা কি স্বর্গের দৃশ্যই যে দেখিলাম, তাহা এই ১৬। ১৭ বৎসর পরে তোমাদিগকে ভাঙ্গিয়া বলিতে পারি না। তিনি সেই মেয়েটীকে তাঁহার বাড়ীতে পাঠাইতে আদেশ করিয়া গেলেন। তদনুসারে পরদিন আমরা মেয়েটীকে তাঁহার বাড়ীতে পাঠাইলাম। অপরাহ্নে দেখি, মেয়েটী পরম আদর লাভ করিয়া দুই জোড়া নব বস্ত্র পাইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। তৎপরে তাঁহারই আদেশ ক্রমে আমরা বালিকাটীর পড়া শুনার বন্দোবস্ত করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছি এমন সময় তাহার মাতা তাহাকে লইয়া কোথায় সরিয়া গেল।

আর এক দিন বিদ্যাসাগর মহাশয় কলিকাতার এক রাজাদের বারাণ্ডাতে বসিয়া বাড়ীর কর্ত্তাদের সহিত গল্প করিতেছেন। রাত্রি দুই চারি দণ্ড হইয়াছে। এমন সময়ে একটী পথ-ভিখারী রাজাবাবুদের দ্বারে আসিয়া ভিক্ষার জন্য চীৎকার করিতেছে। তাহার চীৎকারে বাবুদের বড়ই বিরক্তি হইতেছে। অমনি দ্বারবান গলা ধাক্কা দিয়া প্রহার করিতে করিতে তাহাকে দূরে লইয়া চলিল। ধনীর দ্বারে দরিদ্রের এই নিগ্রহ দেখিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রাণে বড়ই ব্যথা লাগিল। তিনি আর কথা কহিতে পারিলেন না। অমনি রাজা বাবুদের নিকট বিদায় লইয়া নামিয়া আসিলেন ও সেই পথ-ভিখারীকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া তাহাকে বলিলেন—"দেখ্ তুই যদি আমার কাছে একটা প্রতিজ্ঞা করিস্ ত তোকে আমি একটা টাকা দি।" সে তৎক্ষণাৎ প্রতিজ্ঞা করিতে প্রস্তুত হইল। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন;—"তুই প্রতিজ্ঞা কর্ যে এ বাড়ীতে আর ভিক্ষা করিতে আস্‌বি না।" এই বলিয়া তাহার হাতে একটা টাকা দিয়া প্রস্থান করিলেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দয়া কোন জাতি বা সম্প্রদায়ে বদ্ধ নয়। বর্দ্ধমানে যখন এপিডেমিক জ্বরের বড় প্রাদুর্ভাব হয় তখন দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর শুনিয়া সুস্থির থাকিতে পারেন নাই। নিজের ব্যয়ে এক জন ডাক্তার নিযুক্ত করিয়া এবং শত শত লোকের মত ঔষধ ও পথ্য লইয়া তিনি বর্দ্ধমানে গেলেন; এবং ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্য্যন্ত সকল শ্রেণীর গরিব লোকের বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া ঔষধ ও পথ্য বিতরণ করিতে লাগিলেন। সে সময়ে যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহাদের মুখে শুনিয়াছি যে তাঁহারা অনেক সময় দেখিয়াছেন যে বিদ্যাসাগর মহাশয় এক গাড়িতে করিয়া রাশীকৃত সাগুদানা, ও ঔষধ লইয়া ঘুরিতেছেন, হয় ত একটী মুসলমানের ছেলে তাঁহার কোলে কিম্বা একাসনে বসিয়া আছে। সে সময়ে তাঁহার পর-হিতৈষিতা দেখিয়া সকলে অবাক হইয়াছিল।

একবার একটী ফিরিঙ্গী স্ত্রীলোক ভিক্ষা করিবার জন্য তাঁহার নিকট আসে। সেই রমণী উপরে আসিলে, বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহাকে বসিবার আসন দিয়া সবে এই কথা বলিবার উপক্রম করিতেছেন যে, "সহরে বড় বড় ইংরাজ

আছে, তাদের কাছে তোমরা কেন যাও না।" এমন সময়ে দেখিলেন স্ত্রীলোকটী অতিশয় হাঁপাইতেছে। কারণ জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল যে সে অনাথা বিধবা, তাহার পুত্র কন্যা অনেকগুলি, উপায় কিছু নাই। ইহার উপরে আবার তাহার শ্বাস কাশ হইয়াছে। অমনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চক্ষে জল পড়িতে লাগিল। তিনি ব্যস্ত সমস্ত হইয়া স্বয়ং পাখা লইয়া তাহাকে বাতাস করিতে লাগিলেন ও পরে তাহাকে সমুচিত অর্থ সাহায্য করিয়া বিদায় করিলেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দয়ার কথা কি বলিব। সচরাচর দেখিতে পাই, লোকে যাহার প্রতি বিরক্ত থাকে, যাহার চরিত্র দেখিয়া ঘৃণা করে তাহাকে আর দয়া করিতে পারে না। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কি আশ্চর্য্য দয়া, যাহার চরিত্র দেখিয়া তিনি অন্তরের সহিত ঘৃণা করেন তাহার অথবা তাহার স্ত্রীপুত্রের দুঃখের কথা শুনিলেও সুস্থির থাকিতে পারেন না। কলিকাতার একটী বড় মানুষের সঙ্গে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বন্ধুতা ছিল। ঐ বড়মানুষের একটী বয়ঃপ্রাপ্ত পুত্র পিতার সহিত বিবাদ করিয়া ও অন্যান্য অনেক অন্যায় কাজ করিয়া বাড়ী হইতে চলিয়া যায়। সেই কারণে পিতার সহিত তাহার আলাপ পর্য্যন্ত বন্ধ হইয়া যায়। সেই যুবক সপরিবারে নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইয়া অবশেষে পীড়িত হইয়া কলিকাতায় আসে। আমাদের সহিত বালক কাল হইতে তাহার আত্মীয়তা ছিল, সুতরাং কলিকাতায় পৌঁছিয়া আমাদের বাসাতেই আসিয়া উপস্থিত হয়। কলিকাতায় আসিয়া তাহার পীড়া দিন দিন বাড়িতে লাগিল। এমন কি তাহার বাঁচার আশা ছাড়িতে হইল। এই গুরুতর পীড়াতে পড়িয়া সে যুবক একদিন বলিল—"তোমরা যদি পার, আমার পিতাকে একবার ডাকিয়া আন।" তাহার পিতার সহিত আমাদের পরিচয় ছিল না। একে অপরিচিত, তাহাতে বড়মানুষ—আমাদের কথায় গরিবের কুটীরে কুপুত্রকে দেখিতে আসিবেন কেন? অপার ভাবনায় পড়িলাম। অবশেষে নিরুপায় হইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়কে গিয়া ধরিলাম। তিনি ত প্রথমে আমাদিগকে তিরস্কার করিলেন, পরে বলিলেন "সে অতি অসৎ, সে পিতার সহিত অতিশয় উদ্ধত ব্যবহার করিয়াছে, আমি তাহার চরিত্রের জন্য তাহাকে ঘৃণা করি, আমি কি করিয়া গিয়া তাহার পিতাকে ধরিব?" আমরাও ছাড়িবার পাত্র নই। অবশেষে বিদ্যাসাগর মহাশয় আমাদের স্নেহের দায়ে সেই দুষ্কর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎপর দিন তাহার পিতাকে লইয়া আমাদের বাসাতে আসিলেন। পিতা পুত্রে দেখা হইল; বিদ্যাসাগর মহাশয় বাঁচিলেন। কিন্তু যখন শুনিলেন যে তাহার স্ত্রীপুত্রের ভরণপোষণের ও তাহার রোগের শুশ্রূসার জন্য একটী পয়সাও নাই, অমনি তাঁহার দয়ার সঞ্চার হইল। আমাদিগকে বলিয়া গেলেন "দেখিও উহার স্ত্রীপুত্রের যেন ক্লেশ হয় না, এবং চিকিৎসার যেন ত্রুটী হয় না, এজন্য কিরূপ খরচের প্রয়োজন আমাকে জানাইও।"

আজ এই পর্য্যন্ত। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দয়ার বিষয়ে এরূপ গল্প অনেক আছে। যদি জানিতে পারি এই সকল গল্প "সখা"র পাঠক পাঠিকার ভাল লাগিতেছে, তাহা হইলে পরে আরও প্রকাশ করা যাইতে পারে।

খোকা মণি বড় খুসি, গাল ভরা হাসি
দেখে যা পাড়ার লোক কত শোভা রাশি!

সুন্দর মায়ের কোলে সুন্দর সন্তান!
কবি বলে, এই শোভা স্বরগ সমান।

আবদারে ছেলে।

সুন্দর খেলনা দেখে অন্য শিশু হাতে,
অবোধ শিশুর লোভ পড়িল তাহাতে।
দুই শিশু, হিত-কথা কেহই বোঝেনা,
এক জন যাহা চায় অন্যে তা ছাড়েনা।
হলো যে বিষম জ্বালা, কাঁদিল সন্তান,
কতই বুঝান মাতা, নাই দেয় কাণ।
মা তারে চাপেন বুকে, করেন চুম্বন,
লক্ষ্মী ছেলে, সোণামণি, বাপ, যাদু ধন,
কতকি বলেন মাতা, কোলেতে করিয়া,
এঘর ওঘর করে বেড়ান ঘুরিয়া।
এটা ওটা সেটা দেন তার হাতে তুলে,
আবদারে ছেলে মার কিছুতে না ভুলে।
আর্ধ ভাষে সেই বুলি, সেই অশ্রু ঝরে,
'কি দিয়ে ভুলাই,' মাতা ভাবেন অন্তরে।
অবশেষে কাকাতুয়া আছিল যথায়
লইয়া প্রাণের ধনে চলেন তথায়।
এত যে ক্রন্দন তার, এত আবদার,
কি আশ্চর্য্য, পাখী দেখে কিছু নাহি আর!
মা বলেন,—"কাকাতুয়া," পাখী তাই বলে;
যে দিকে পেয়ারা যায় সেই দিকে চলে।
খোকা মণি বড় খুসি, গাল ভরা হাসি
দেখে যা পাড়ার লোক কত শোভা রাশি!
সুন্দর মায়ের কোলে সুন্দর সন্তান!
কবি বলে এই শোভা স্বরগ সমান।

চীনের গল্প।

আমি একখানা বড় মজার বই পড়িয়াছি। পড়িবার সময় পাঠক পাঠিকারা যদি কাছে থাকিতেন, তবে কত আমোদই পাইতেন। পড়িয়াছি, আর দুঃখ করিয়াছি, কাছে বসিয়া শুনিবার জন্য অধিক লোক নাই। বই খানাতে চীন দেশী লোকের কথা লেখা আছে। চীন দেশটা কোথায়, তাহা হয় তো তোমাদের অনেকেই জান। আর চীনেমান্‌গুলিকেও হয় তো অনেকেই দেখিয়াছ। সেই যে সাদা লোকগুলি; সেই যে, চ্যাপ্টা মুখ, খাঁদা নাক, মিট্‌মিটে চোখ, লম্বা টিকী, জুতো তৈরি করে, ছুতোরের কাজ করে, ওয়াহ্ কোওহ ওয়াঙ্ চু করিয়া কথা বলে, আফিম খায়, সেই লোকগুলি। চীনের লোকেরা খুব প্রাচীন কালে সভ্য হইয়াছিল। এরাই প্রথম অক্ষর কাটিয়া ছাপ তুলিতে শিখে। এরাই বারুদের সৃষ্টি করে। একটা দেশের সঙ্গে যুদ্ধ হইত বলিয়া এরা অনেক দিন হইল ঐ দেশ আর চীন দেশের মাঝখানে একটা প্রকাণ্ড দেয়াল দিয়া ফেলিল। সে এমনি দেয়াল যে তেমন আর পৃথিবীতে নাই। আমাদের দেশে এখনও অজ্ঞ লোকের বিশ্বাস আছে যে, যত কল সব চীন দেশে তৈরি হয়। চীন দেশের লোকের মতন পৃথিবীর আর কোন জাতি এত ভাল ঘুড়ি উড়াইতে পারে না।

সেই পুস্তক খানাতে ইহাদের সম্বন্ধে অনেক কথা লেখা আছে। এক একটা কথা এমনি হাসিবার

যে, পড়িবার সময় যে কত হাসিয়াছি তাহার তো কথাই নাই, এখন আমার 'চীনেমান্' গুলিকে দেখিলেই হাসি পায়। আগে চীনদেশী ছেলে মেয়ের সম্বন্ধে কতকগুলি কথা বলিব, তার পর ইচ্ছা আছে মাঝে মাঝে চীন দেশী গল্পের ঝুড়ি খুলিয়া পাঠক পাঠিকাদিগকে আমোদ দিব।

বেটা ছেলেটী জন্মিলে চীন দেশী বাপ মা বড় খুসী হন, আর খুব ধুমধাম করেন। মেয়ে ছেলেটী যদি হইল তবে তাঁহারা বড় দুঃখিত। সেখানে মেয়েদের বড় অনাদর। অনেক পরিবারে তাহাদের নাম পর্য্যন্ত রাখা হয় না; অনেক গুলি মেয়ে হইলে তাহাদিগকে ডাকা হয় 'একের নম্বর', 'দুয়ের নম্বর' ইত্যাদি। কোন কোন জায়গায় মেয়ে জন্মিলে পর তিন দিন তাহাকে মেজেতে ন্যাকড়া পাতিয়া তাহার উপর ফেলিয়া রাখা হয়। ইহার অর্থ, মেয়ে বড় হইলে ঐরূপ আদর পাইবে।

তিন দিনের হইলে ছেলেটীকে স্নান করান হয়। সেই স্নানের জলে বাপ মা কত জিনিসই মিশাইয়া দেন, মনে করেন ইহাতে ছেলে ভাগ্যবান্ হইবে। তার পর আর কিছু জল দিয়া ছেলেটীকে ধোওয়া হয়। এই জলে অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে কিঞ্চিৎ মুদ্রা আর রূপা ফেলিয়া দেন—ছেলের খুব টাকা কড়ি হইবে। গায়ের রং ভাল হইবে বলিয়া ডিম ভাঙ্গিয়া তাহার সাদা অংশটা গায়ে মাখাইয়া দেন। শেষে পেঁয়াজ দিয়া তাহার পাছায় আঘাত করা হয়; ইহাতে ছেলে খুব চালাক হইবে।

এর সঙ্গে সঙ্গে লাল সুতা দিয়া তাহার হাত দুখানি বাঁধিয়া দেওয়া হয়। কখন কখন কয়েক মাস ধরিয়া হাত এইরূপে বাঁধা থাকে। এরূপ করিলেই আর বড় হইয়া দুষ্টু ছেলে হইতে পারে না, আর ভয় পাইয়া হাত পা ছুড়িতে পারে না। দড়ীটা খুব লম্বা থাকে, সুতরাং ছেলে ইচ্ছামত হাত নাড়িতে পারে। মাঝে মাঝে হাতে পয়সা বাঁধিয়া দেন—এর কারণ, যদি ভূত টুত ছেলেটীকে উৎপাত করিতে আসে, তবে এই পয়সাতে তাহারা সন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া যাইবে।

অল্প দিন পরেই ক্ষুর দিয়া ছেলের মাথার চুল চাঁছিয়া ফেলা হয়। তবেই চুল শীঘ্র শীঘ্র উঠে। চুল এক ইঞ্চি দু ইঞ্চি লম্বা হইলে বেশ করিয়া তাহাকে একটী ছোট ল্যাজের আকারে বাঁধিয়া দেওয়া হয়। টুপীতে একটী ছিদ্র থাকে, তাহার ভিতর দিয়া ল্যাজটী বাহির হইয়া থাকে।

মেয়ে ছেলের বেলা এ সব যত্ন কিছুই করা হয় না। অনেক স্থানে মেয়ে হইলেই তাহাকে মারিয়া ফেলে। তাহাদিগকে কেহ চায় না, তাহাদের আবার কে খাইতে দিবে! সাধারণতঃ তাহাদের বাবারাই এই নৃশংস কাজ করিয়া থাকে। গলায় পাথর বাঁধিয়া জলে ফেলিয়া দেয়। অনেক নিষ্ঠুর লোক তাহাদের নবজাত মেয়েগুলিকে পোড়াইয়া মারে। অনেক ধনী লোক ও মাঝে মাঝে মনে করেন যে তাঁহাদের ঢের মেয়ে হইয়াছে, আর দরকার নাই। এর পর মেয়ে হইলে তাঁহারাও ঐরূপ মারিয়া ফেলেন।

এক জন কামারের ক্রমে দুইটী মেয়ে হইয়া দুইটীই নিতান্ত শিশু অবস্থায় মরিয়া গেল। কিছু দিন পর আর একটী মেয়ে হইল। বাপ মা মনে করিল যে এ আর কিছুই নয়,—একটা ভূত বার বার আসিয়া তাহাদিগকে উৎপাত করিতেছে। এটা কখনও ভাল ভূত নহে। এইরূপ যুক্তি করিয়া কামার অনেকগুলি কাঠ সংগ্রহ করিয়া

একটা বড় আগুন করিল, আর মেয়েটাকে তাহাতে ফেলিয়া তামাসা দেখিতে লাগিল। শেষে তাহার শরীরের অঙ্গারগুলি জলে ফেলিয়া দিয়া আসিল।

আর একটী শিশু মেয়ের মা তাহাকে সমস্ত রাত্রি মেজেতে ফেলিয়া রাখিল। সকালে মেয়ের বাবা আসিয়া দেখিয়া তাহাকে ডুবাইয়া মারিবার জন্য জল আনিতে গেল। এর মধ্যে এক জন স্ত্রীলোক আসিয়া এ সব দেখিল। সে মেয়েটীর বাবাকে বলিল 'তুমি একে মারিও না, একটু অপেক্ষা কর।' এই কথা বলিয়া সে এক জন খ্রীষ্টান ধর্ম্ম-প্রচারিকার কাছে গিয়া খবর দিল। তিনি আসিয়া মেয়েটীকে নিতে চাহিলেন। মেয়ের বাবা তাহাতে কোন আপত্তি করিল না, সে ভাবিল আপদ বিদায় হইলেই বাঁচি। বিবি তাহাকে লইয়া আসিলেন, এবং তাহাকে খুব যত্নে মানুষ করিতে লাগিলেন। কিন্তু মেয়েটী শীঘ্রই মরিয়া গেল।

ছেলে মেয়ে মরিয়া গেলে চীন দেশী লোকেরা মনে করে যে ছেলের বাবা অথবা তাহার পিতামহ কাহারও নিকট হইতে টাকা ধার করিয়াছিল এবং তাহা দেয় নাই; সুতরাং সেই লোকটা মরিয়া ইহাদের ঘরে আসিয়া পুনরায় জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। এত দিন তাহাদের পয়সা খরচ করাইয়া, তাহাদের অন্ন ধ্বংস করিয়া, এখন চলিয়া-গিয়াছে। সুতরাং ছেলের অসুখ হইলে তাহাকে খুব যত্ন করা হয়, কিন্তু মরিয়া গেলেই মনে করে যে ঐরূপ একটা ভূত আসিয়াছিল, তাহাকে যত শীঘ্র ফেলিয়া দেওয়া হয় ততই ভাল। মৃত দেহটী বাড়ীর বাহিরে লইয়া যাইবার সময় তাহারা বাড়ী ঝাড়ে এবং পট্‌কা পোড়াইয়া ও ঘণ্টা বাজাইয়া ভূত তাড়াইতে চেষ্টা করে।

ছেলে মেয়ে হাটিতে শিখিলেই তাহাদিগকে কাজ করিতে শিখান হয়। চীন দেশের ছেলে মেয়েদিগকে এত বেশী কাজ করিতে হয় যে, বেচারীরা খেলা করিবার সময় পায় না। ছেলে বয়সেই বুড়াদের মত তাহাদের মুখ ব্যস্ত ও গম্ভীর হইয়া যায়। ৬।৭ বছর বয়স হইলে তাহাদিগকে পড়িতে শিখান হয়। চীন দেশে আমাদের ন্যায় অক্ষরের সাহায্যে শব্দ প্রস্তুত করিবার রীতি নাই। সেখানে প্রত্যেকটী কথার জন্য এক একটা নূতন চিহ্ন ব্যবহার করিতে হয়। তোমাদের অনেকেই বাজার হইতে পট্‌কা কিনিয়া আনিয়া থাকিবে। পট্‌কার বাক্সের উপরে লাল কাগজে সোণার অক্ষরে কতকগুলি কি আঁকা থাকে তাহা দেখিয়া তোমরা হয় তো মনে করিয়া থাকিবে যে, ঐ বুঝি চীন দেশীয় কোনরূপ গাছের অথবা জাহাজের ছবি। কিন্তু বাস্তবিক উহারা এক একটী অক্ষর। ভাষায় যতগুলি শব্দ আছে, ঐ প্রকার চেহারা বিশিষ্ট ততগুলি অক্ষরের সঙ্গে পরিচয় হইলে তার পর মনে করিতে পার যে, ছেলের বর্ণ পরিচয় হইল। সুতরাং তাহাদের অক্ষর পরিচয় হইতেই জীবন যায়।

১৪।১৫ বছরের হইলে ছেলেকে স্কুলে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। স্কুলে যাওয়ার পর হইতে সে খেলা করিতে পারিবে না। সকালে ঘুম হইতে উঠিয়া স্কুলে যাইবে আর সন্ধ্যার সময় তাহার ছুটী হইবে। তার পর কিরূপ গুরু মহাশয়ের নিকট পড়িতে হইবে তাহা চেহারা দেখিয়াই বুঝা যাইতে পারে। চেহারার একটী বিষয় নিয়া বোধ হয় তোমাদের কিছু গোলমাল লাগিয়াছে; উহাতে একটী থলিয়া আর একটী নল থাকিবার উদ্দেশ্য হয় তো অনেকেই বুঝিতে পার নাই। থলিয়াটীর ভিতর কি কি আছে আমি ভাল করিয়া জানি

না, তবে একটী দেশলাইয়ের বাক্স এবং কিঞ্চিৎ আফিম আছে একথা বলিয়া দিতে পারি। হাতের নলটী আফিম খাইবার যন্ত্র। ঐ জিনিসটী চেহারায় উঠিয়াছে,তাহাতেই বুঝিতে পার মাষ্টার মহাশয় ইহার কিরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন; এবং ঐরূপ ব্যবহারের পর মাষ্টার মহাশয়ের মাথা কত দূর পরিষ্কার থাকে তাহাও একবার অনুমান করিয়া লইবে।

তোমরা পাঠ বলিবার সময় মাষ্টারকে সম্মুখে করিয়া পাঠ বলিয়া থাক; চীন দেশীয় ছাত্রদিগকে মাষ্টারের দিকে পৃষ্ঠ দেশ রাখিয়া পড়া বলিতে হয়। নহিলে মাষ্টার মহাশয় মনে করেন যে তাঁহার হাতের বই দেখিয়া ফাঁকি দিবে। ইহাতে তিনি যে ভয় করেন তাহারই সহায়তা হয়। কেমন করিয়া হয় বলিব না। চীন দেশের স্কুলে সচরাচর শাস্তি দেওয়ার নিয়ম নাই। নিল ডাউন করিয়া রাখা, মাথায় টোকা দেওয়া ইত্যাদি শাস্তি মাঝে মাঝে দেওয়া হইয়া থাকে। কখন কখন পূর্ণ এক কড়া জল তাহার মাথায় রাখিয়া তাহাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে বলা হয়; এক ফোঁটা জল মাটিতে পড়িলেই বেত খাইবার নিয়ম। সহজে যদি উপকার না হইল তবে মাষ্টার মহাশয় এক খণ্ড কাঠ লইয়া তাহার হাতে এবং পীঠে আঘাত করেন। তাহাতেও যদি না শুধরাইল তবে মাষ্টার মহাশয় এক বাঁশ লইয়া তাহার সাহায্যে ছাত্রকে সংশোধন করেন।

মেয়েদের জন্য স্কুল অতি অল্পই আছে। সাধারণতঃ মেয়েদিগকে স্কুলে দেওয়াই হয় না।

নাক ও চোকের বিবাদ।

"কার তরে চশমার হয়েছে সৃজন,"
এই লয়ে ঘোর দ্বন্দ্ব করে দুই জন।
নাক বলে "তিল মাত্র বুদ্ধি আছে যার,
সে বুঝিবে চশমার দেখিয়া আকার।
অবশ্যই মোর তরে চশমা সৃজন,
নতুবা তাহার কেন এমন গঠন।
আমার উপরে কিবা থাপে থাপে বসে;
হাঁটো, ছোটো, উঠো বসো, কভু নাহি খসে!
আমাকে ছাড়িয়া শোভা থাকে কি তাহার,
আমাতে বসিলে তার কেমন বাহার।"
চোক বলে, "আমি যদি পাতা নাহি খুলি?
কি হেতু মানুষ তবে পরিবেরে ঠুলি?"
জলিয়া উঠিল নাক অগনি সমান,
রক্তিমা বরণ হ'লো রাগে কম্পমান।
"কেন মিছে এত কথা, বকিতেছ তুমি,
তোমা হতে সর্ব্বগুণে শ্রেষ্ঠতর আমি;
আমি যদি নাহি থাকি, চলে কি ধরণী?
নিশ্বাস ঠেকিয়া লোক, মরিবে এখনি।
ফুলের গৌরব যত আমা হতে হয়;
গোলাপ, আতর, মান আমা হতে পায়;
আমি যদি নাহি থাকি, মানব নিচয়
কেমনে সুগন্ধি দ্রব্য করিবে নির্ণয়;
তুই বিনা বাঁচে জীব কাণা কহে তারে,
যা যা চোক্ কেবা তোরে পুছে এ সংসারে?"

জবাফুল সম চোক, হইল শুনিয়া,
থর থর কাঁপে পাতা, থাকিয়া থাকিয়া।
বলে—"নাক, কার কাছে করিস্ বড়াই,
দিন রাত কাছে থাকি অগোচর নাই।
ও দুটো বিবর তোর নর্দ্দমার মত,
কফ্ শর্দ্দি জলকত বহে অবিরত;
নিদ্রা কালে তোর ডাকে ত্রাস লাগে প্রাণে,
ভাবিবে কলুর ঘানি যে বা নাহি জানে।
বলিলি মানের কথা এই তোর মান,
নাক মলা দিয়ে লোকে করে অপমান।
যার তুই, সেও তোকে কভু নাহি ছাড়ে,
শর্দ্দি হ'লে তোরে মলে যেথা সেথা ঝাড়ে।
বাক্য ব্যয়ে কাজ নাই, পাতা না মেলিব,
তোমার বড়াই কত, এখনি দেখিব।"
"তথাস্তু" বলিয়া নাক ছিদ্র বন্ধ করি,
বসিল রাগিয়া তবে, বিসম্বাদ করি।

বাধিল বিষম গোল, উঠিল ক্রন্দন রোল,
আর আর ইন্দ্রিয় ভিতরে;
"কিহল" "কিহল" ধ্বনি, হঠাৎ শ্রবণে শুনি,
ভয় হ'ল মানব অন্তরে।
আঁধারেতে কোন খানে পড়িয়া মরিবে প্রাণে
পদ তাই চাহেনা চলিতে;
সুমিষ্ট কি তিক্ত হায়, মুখেতে আনিয়া দেয়,
জিভ তাই চাহেনা খাইতে।
কিছু না বুঝিতে পারে, এক ছেড়ে আর ধরে,
হাত বলে একি হ'ল দায়;

কাণেরা বসিয়া দূরে, সঠিক বুঝিতে নারে,
ভাবিল পরাণ বুঝি যায়।
মুখ দিয়া পথ খুলে, নিশ্বাস সজোরে চলে,
হাঁ করিয়া রহিল আনন;
পেট বলে একি হল, অনাহারে প্রাণ গেল,
কেন আজি ঘটিল এমন।
রসনা ডাকিয়া তবে, বলিল ইন্দ্রিয় সবে,
এস ভাই কি দেখিছ আর!
এ বিবাদ ঘরে ঘরে, একারণে সবে মরে,
শালিসিতে করিবে বিচার।
সবে তাতে দিল সায়, নাক চোক সে সভায়,
রাজি হয়ে জানাল সম্মতি;
প্রতিজ্ঞা করিয়া তবে, বসিল ইন্দ্রিয় সবে,
ধীরভাবে করিতে যুকতি।
মিটে গেল গোল পলাইল রোল,
সভায় সবার মতি,
সবে মিলে কাণে প্রধান আসনে,
বসাইল সভাপতি।
ছিদ্র খুলে দিয়া, বিনয় করিয়া,
বলে নাক খাঁট স্বরে;—
"শুন সবে ভাই, যার নাক নাই
কেমনে চশমা পরে?
তাই দ্বন্দ্ব করি, চশমা আমারি,
বিচার করিব মিলি,
নত করে ঘাড়, সভার বিচার,
লইব সঠিক বলি।"
পাতা দিয়ে খুলে, চোক এসে বলে,
"শুন শুন মোর যুক্তি,
যুক্তি শুনে সবে, বিচার করিবে
নির্দ্দোষীরে দিবে মুক্তি।
দৃষ্টি হলে কম; করে উপশম,
এগুণ চশমা ধরে;
তাইত সকলে, দৃষ্টি ক্ষীণ হ'লে,
যতনে চশমা পরে।
দুপক্ষ শুনিয়া, বিচার করিয়া,
বল যাহা সত্য মোরে।"
দাঁড়াইয়া তবে, সুগম্ভীর রবে,
সভাপতি বলে জোরে;
শুন শুন সভাজন সভার বিচার,
অপরাধী নাকে আজি দিতেছি ধিক্কার।
দৃষ্টি ক্ষীণ চোক তরে, চশমা মানব পরে,
নাক শুধু নত ভাবে করিবে বহন,
নতুবা শরীর তার হইবে কর্ত্তন।

কুকুরের চাতুরী।

একটী ভদ্র লোকের কুকুর সর্ব্বদা তাঁহার সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়াইত। একদিন এক বাড়ীতে রাত্রে তাঁহার নিমন্ত্রণ হয়। কুকুরটী সঙ্গে গিয়া উপস্থিত। তাঁহারা আহারাদি করিতেছেন, কুকুরটী এক পাশের অন্ধকার ঘরে ঘুমাইয়া আছে। তিনি বাড়ী যাইবার সময় কুকুরটীকে দেখিতে পাইলেন না; ভাবিলেন, সে বুঝি চলিয়া গিয়াছে। একা ঘরে ফিরিয়া গেলেন। ওদিকে গৃহস্থের ভৃত্যেরা বাড়ীর দ্বার বন্ধ করিয়া সেই ঘর বন্ধ করিয়া নিদ্রা গিয়াছে। গভীর রাত্রে কুকুরের নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া সে ভয়ানক বিপদে পড়িল। বাহিরে যাইবার পথ পায় না। যাহোক অনেক কষ্টে একটী জানালা আঁচড়া-

ইয়া খুলিয়া প্রায় একতলা সমান উচু জায়গা হইতে বাহিরে পড়িয়া সে দিন ঘরে গেল। তার পর আর একদিন রাত্রে তার প্রভুর সেই বাড়ীতে নিমন্ত্রণ। কুকুর ও তাহার সঙ্গে গিয়াছে। কিন্তু সে দিন ভদ্রলোকটী আসিবার সময় নিজের লাঠি ও টুপি খুজিয়া পান না। আলো ধরিয়া এদিক ওদিক অন্বেষণ করিতে করিতে দেখেন যে কুকুরটী লাঠি ও টুপিটী লইয়া গিয়া তাহার উপরে পা দুখানি রাখিয়া ঘুমাইতেছে। তখন বুঝিতে পারিলেন যে পূর্ব্ব রাত্রে ফেলিয়া যাওয়াতে সে এবারে ঐ বুদ্ধি খেলিয়াছে।

ধাঁধা।

নূতন।

১। তিন অক্ষরে এমন একটী স্থানের নাম কর যাহার প্রথম ও দ্বিতীয় একত্রে লইলে এমন একটী দ্রব্যের নাম হয় যাহা সর্ব্বদাই তোমার সঙ্গে আছে এবং প্রথম ও তৃতীয় লইলেও সেই একই দ্রব্যর নাম; বলত সেই স্থানের নাম কি?

২। ৪০ জন লোক এক নিমন্ত্রণে উপস্থিত ছিল। ইহাদের মধ্যে কতগুলি ব্রাহ্মণ, কতগুলি কায়স্থ ও কতগুলি মুসলমান। নিমন্ত্রণ কর্ত্তা ৪০ খানা পাতা দ্বারা প্রত্যেক ব্রাহ্মণকে ৩ খানা, কায়স্থকে ২ খানা এবং প্রত্যেক তিনজন মুসলমানকে এক খানা করিয়া দিয়া বসাইয়া দিলেন। এখন এই নিমন্ত্রণে কতগুলি ব্রাহ্মণ, কতগুলি কায়স্থ ও কতগুলি মুসলমান উপস্থিত ছিল বল দেখি?

৩। এক দিন চন্দ্র বনের ধারে বেড়াইতেছিল, এমন সময় তাহার দাদা একটী র আনিয়া তাহার সহিত যোগ করিয়া দিলেন; দিবা মাত্র সে এক প্রকার শব্দ করিতে করিতে বনে প্রবেশ করিল। ঘলত কেমন করে?

৪। নানা বর্ণ ধরি আমি একই শরীরে।
কারো সঙ্গে নাহি থাকি মেঘ নীরে॥
ভানু বিপরীত দিকে যদি মেঘ হয়।
তখনি জানিবে সবে আমার উদয়॥

৫। ঘরে ঘরে নৃত্য করে, দেখিতে না পাই।
সর্ব্বক্ষণ তার কার্য্য রাত্রি দিবা নাই॥
স্মরণেতে ভয় হয় পরশনে নয়।
মিত্র কিন্তু হয় সেই, লোকে শত্রু কয়॥

৬। মাংস নাই, হাড় নাই আঙ্গুল আছে তার,
বল দেখি শিশু ভাই কি নাম তাহার।

৭। এক বর্ষ ধরে মোর কতই আদর,
এক বর্ষ পরে সবে করে অনাদর।
মোর মতে কার্য্য করে এক বর্ষ ধরে,
সময় হইলে গত, নাহি গ্রাহ্য করে।

৮। কি এমন আছে যাহা দেখিয়াছে সবে,
কিন্তু তাহা আর কেহ দেখিতে না পাবে।

ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৬।

পূর্ণিমা ও অমাবস্যা।

ত্রিকালে পূর্ণিমা তিথিতে আকাশের কেমন শোভা হয়! কিন্তু আবার যে দিন অমাবস্যা তিথি, সে দিন রাত্রি কি ভয়ানক অন্ধকার!

ভাল, জিজ্ঞাসা করি, পূর্ণিমার রাত্রিতে যে সুন্দর চাঁদ দেখা যায় অমাবস্যার রাত্রিতে সে কোথা যায়? এ কথা কি কখন মনে উদয় হয়? আবার মধ্যে কয়দিন চন্দ্রের আকার ক্রমে ক্রমে ক্ষয় হইয়া হইয়া শেষে একেবারে অদৃশ্য হয়; এবং অমাবস্যার পরে আবার ক্রমে ক্রমে একটু একটু করিয়া বৃদ্ধি হইয়া পুনরায় পূর্ণচন্দ্র দেখা দেয়। প্রায় একমাসে একবার পূর্ণচন্দ্র হইতে কমিয়া অমাবস্যা ও অমাবস্যার পর হইতে বাড়িয়া পূর্ণিমা দেখা যায়। ইহার কারণ বোধ হয় তোমরা মনে মনে ভাবিতে পার নাই। আজ আমরা সহজ করিয়া বলিতে চেষ্টা করিব। প্রকৃতির মধ্যে এই রকম হাজার হাজার আশ্চর্য্য কাণ্ড সর্ব্বদাই আমরা দেখি। যিনি এই গুলির কারণ অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিতে পারেন তিনিই বিদ্বান ও বড় লোক হইয়া থাকেন।

শিশু যে চাঁদকে "আই আই" বলিয়া হাত নাড়িয়া থাকে, লোকেও যে চাঁদকে নহিলে সুন্দর জিনিসের তুলনা দিতে পারে না, সেই শোভার আকর পূর্ণ-শশী কি? তোমরা এত কচি ছেলে নও যে, ঠাকুর মা তোমাদের চোকে ধূলি দিয়া বুঝাইয়া দিবেন—"চাঁদ একটা দেবতা" বা "চাঁদ স্বর্গের বাতি" ইত্যাদি। চন্দ্র পৃথিবীর উপগ্রহ। পৃথিবী যেমন সূর্য্যের চারিদিকে এক বৎসরে ঘুরিয়া আসে, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, ইউরেনস্, নেপ্‌চুন্, প্রভৃতি অন্যান্য গ্রহগণ যেমন ক্রমাগত সূর্য্যের চারিদিকে পরিভ্রমণ করিতেছে, চন্দ্রও তেমনি পৃথিবীর চারিদিকে প্রায় এক মাসে ঘুরিয়া বেড়ায়। চন্দ্র যদি সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিত, তাহা হইলে উহার নাম ও গ্রহ হইত। কিন্তু একটী গ্রহের চারিদিকে বেষ্টন করে বলিয়া উহার নাম "উপগ্রহ" হইয়াছে। কখনও ভুলিওনা যে চন্দ্র আমাদের পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়। উহা উপগ্রহ। অন্যান্য গ্রহগণের মধ্যেও কয়েকটীর উপগ্রহ আছে। বৃহস্পতির চারিটী উপগ্রহ আছে, শনির চারিদিকে আটটী উপগ্রহ পরিভ্রমণ করে, ইউরেনসের অন্ততঃ চারিটী, নেপ্‌চুনের একটী। ইহারাও চন্দ্রের মত স্ব স্ব গ্রহের চারিদিক বেষ্টন করে।

এইবার একটী কথা বলিব, তাহা হয়ত

তোমরা বিশ্বাস করিবে না। আর নয়ত বিশ্বাস করিলেও আশ্চর্য্য ও দুঃখিত হইবে। সে কথাটী এই যে,—চাঁদের আলো নাই, উহার নিজের একটুও আলো নাই! তোমরা বলিবে "সে কি? চাঁদের আলো নাই? সমস্ত পৃথিবী যে আলো করে, তাহার আলো নাই? চাঁদ কি তবে চুরি করিয়া আলো আনে?" আমরা বলিব যথার্থই চাঁদ চোর। ঐ যে আলো, ঐ যে হাসি,—উহার একটুও চন্দ্রের নিজের ধন নহে। সবটুকুই সূর্য্যের কাছ হইতে ধার করা। আমাদের পৃথিবীর যেমন নিজের আলো নাই, চন্দ্রও ঠিক তাহারই মত। ঠিক পৃথিবীর মত মাটি, পাহাড়, পর্ব্বত, গহ্বর, এই সকলে চন্দ্র পরিপূর্ণ। প্রভেদ এই যে সেখানে গাছ পাতা নাই—মানুষ প্রভৃতি জন্তু নাই, আর এ রকম বাতাস নাই। সে যাহাই হউক, কথাটা এই যে, চন্দ্র ঠিক পৃথিবীর মত জ্যোতির্ব্বিহীন জড়পিণ্ড, উহার আলো বা তেজ কিছুই নাই।

তবে চন্দ্র পূর্ণিমার রাত্রিতে তত আলো কোথায় পায়?—সূর্য্যের নিকট হইতে। পৃথিবী নিজে জ্যোতি-হীন হইলেও মধ্যাহ্নকালে যেমন সূর্য্যের কিরণে উজ্জ্বল হইয়া উঠে, উহার গাছ পাতা, পথ ঘাট, মাঠ প্রান্তর, পর্ব্বত সাগর, নদী হ্রদ সমস্তই যেমন এক কালে আলোকিত হইয়া ধপ্ ধপ্ করিতে থাকে, চন্দ্রের পক্ষেও ঠিক তাই। চন্দ্র পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরে বটে, কিন্তু সূর্য্যেরও আলো পায়। এই আলোকে চন্দ্রের জমি আলোকিত হইয়া ঝক্ মক্ করিতে থাকে। পৃথিবীর চারিদিকেই যেমন সূর্য্যের কিরণ পতিত হয়, যখন যেদিকে পড়ে সেইদিকে দিন হয় আর তাহার বিপরীত দিকে রাত্রি থাকে; চন্দ্রেরও যে দিকে যখন সূর্য্যকিরণ পড়ে সেই দিকে চন্দ্রের দিন, আর অন্য দিকে চন্দ্রের অন্ধকার রাত্রি। এখন বুঝিয়া দেখ, চন্দ্রের যেদিকে দিন হয় সেই দিকের আলো আমরা দেখিতে পাই। এই আলোককে জ্যোৎস্না বলে। একটী অন্ধকার গৃহের দ্বারের নিকটে রৌদ্রে একখানা ভিজা শ্লেট্ রাখিলে দেখিবে ঐ শ্লেটের ভিতর হইতে রৌদ্রের আভা ঘরের ভিতরে গিয়া লাগে ও তথায় একটা আলো হয়। এইরূপ আলোর নাম "প্রতিফলিত আলোক"। বাহিরে রৌদ্র থাকিলে ঘরের পাশের রাস্তা দিয়া যে সকল লোক চলে, তাহাদেরও প্রতিফলিত আলোক ঐ ঘরের দেয়ালে পড়িতে দেখা যায়। চন্দ্রের আলোক ও ঠিক ঐরূপ। চন্দ্রের উপর সূর্য্যের কিরণ পতিত হইলে উহা উজ্জ্বল হয় এবং ঐ আলোকে সমস্ত চন্দ্র মণ্ডল আলোকময় হইয়া উঠে। তখন আর বুঝা যায় না যে, চন্দ্রের নিজের আলোক নাই।

উপরে বেশ বুঝা গেল যে চন্দ্রের আলো পরের। চন্দ্রের যে ভাগ সূর্য্যালোকে আলোকিত হয় তাহারই আলো আমরা দেখি। চন্দ্রে যদি মনুষ্য থাকিত তাহা হইলে আমাদের পৃথিবীকেও তাহারা ঐরূপ আলোকিত দেখিতে পাইয়া মনে করিত পৃথিবী জ্যোতির্ম্ময়। কিন্তু বস্তুতঃ উহা তাহাদের ভ্রম হইত সন্দেহ নাই।

ভাল, যদি সূর্য্যের আলোকই চন্দ্রের আলোকের কারণ এবং সূর্য্যও ত প্রতিদিন আছে, তবে পূর্ণচন্দ্র একদিন বৈ আর দেখিনা কেন? এ প্রশ্ন তোমরা এখন করিবেই করিবে। আমরা ক্রমে তাহার উত্তর দিব। প্রথমে একটী কথা মনে করিতে হইবে। পৃথিবীর যেমন বার্ষিক গতি দ্বারা ইহা আপন মেরুদণ্ডে গাড়ীর চাকার মত একদিনে একবার ঘুরে; চন্দ্রেরও এই উভয় প্রকার গতি আছে। চন্দ্র প্রায় একমাসে পৃথিবীকে বেষ্টন করে, আবার ঠিক সেই সময়েই

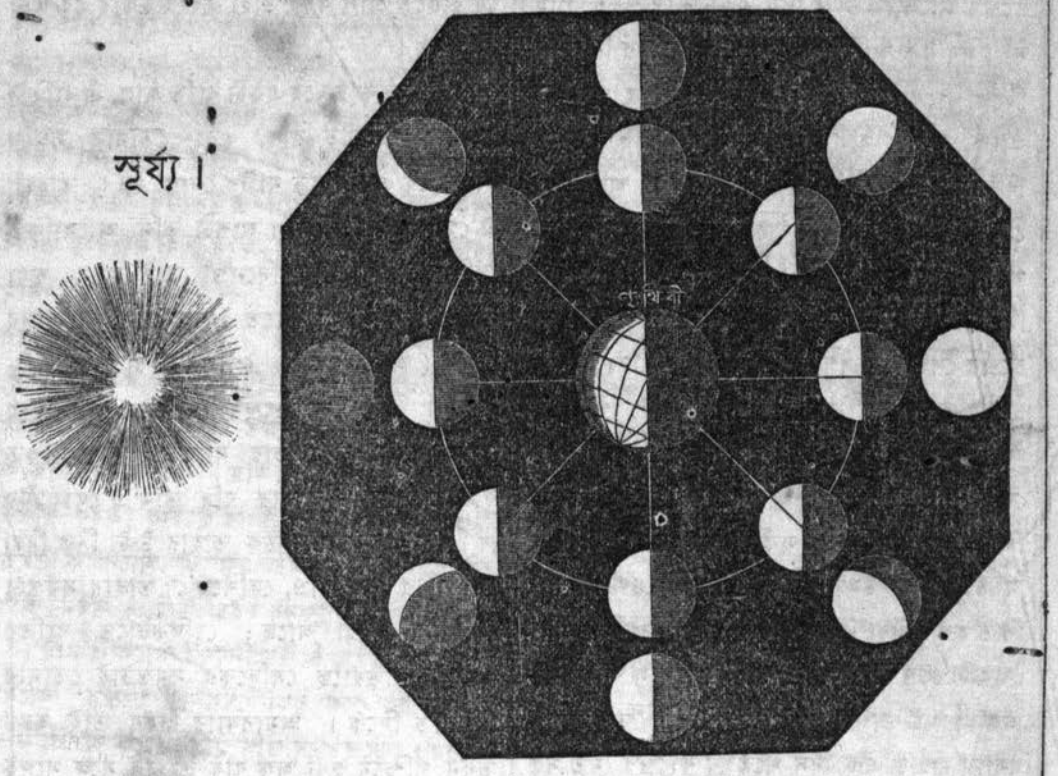

উহা আপন মেরুদণ্ডে একবার আবর্ত্তন করে। এই জন্য একটী বড় বিশেষ ঘটনা হয়। তাহা এই—আমরা পৃথিবী হইতে চন্দ্রের একটী মাত্র দিক দেখিতে পাই, কিন্তু উহার সকল দিকই সূর্য্যের দিকে ফিরে। এ বিষয়টী উদাহরণ ভিন্ন বুঝান যাইবে না। মনে কর ঘরের মধ্যে একটী গোল টেবিলে তুমি বসিয়া আছ, আর ঐ ঘরের কোণে গোপাল রহিয়াছে। আমি তোমার দিকে ফিরিয়া টেবিলটীর চারিধারে প্রদক্ষিণ করিয়া ঘুরিতেছি। তা'হলে তুমি একবারও আমার পশ্চাৎ দিক দেখিতে পাইবে না, কিন্তু গোপাল আমার সকল দিকই দেখিতে পাইবে। বরং পরীক্ষা করিয়া দেখিও। এখানেও ঠিক তাহাই হয়। গোপাল যেন সূর্য্য, তুমি পৃথিবী, আর আমি চন্দ্র। অর্থাৎ চন্দ্র এমনভাবে পৃথিবীকে বেষ্টন করে যে পৃথিবীর দিকে তাহার একভাগ মাত্র থাকে, উহার আর আধ খানা পৃথিবী হইতে কখনই দেখা যায় না। কিন্তু সূর্য্যের দিকে চন্দ্রের সকল ভাগই ফিরিতে পারে। ইহাতে কি হয়, বুঝিতেই ত পারিতেছ :—সূর্য্যের আলোকে চন্দ্রের সকল দিকই পর পর আলোকিত হয়, কিন্তু আমরা চিরকাল পূর্ণিমা দেখিতে পাই না। চন্দ্রের যে আধ খানা আমাদের দিকে ফিরান, যে দিন সূর্য্যের আলোকে সেই দিকটা সমস্ত আলোকিত হয় সেই রাত্রিতে আমরা গোল চাঁদ খানি আলোকিত দেখিয়া তাহার নাম দিই পূর্ণিমা। আর যে দিন ঠিক বিপরীত দিকে সূর্য্যকিরণ পড়ে সে দিন আমরা

Imp. 3961, dt. 2/9/09

চন্দ্রের আলোকিত অংশের একটুও দেখিতে পাই না ; সব টুকু আলোকিত অংশ আমাদের বিপরীত দিকে থাকে। সেই দিন সমস্ত রাত্রি অন্ধকার থাকে, আমরা বলি অমাবস্যার রাত্রি। এই দুটী দিন ছাড়া যে দিন চন্দ্রের আলোকিত অর্দ্ধাংশের যেটুকু আমাদের দিকে থাকে, সে দিন সেইটুকুই আমরা দেখিতে পাই। তাই বলি প্রতিপদ, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, ইত্যাদি।* এ সকল দিনেও চন্দ্রের সেই অর্দ্ধভাগ পৃথিবীর দিকে থাকে, কিন্তু চন্দ্রের ত আর নিজের আলোক নাই, তাই ঐ অর্দ্ধভাগের যেটুকু সূর্য্যের আলো পায় সেই টুকুই দেখিতে পাই, বাকী টুকু দেখা যায় না। যেমন দিনের বেলা নক্ষত্র সকল আকাশেই থাকে অথচ, সূর্য্যের উজ্জ্বলতর কিরণে বায়ুমণ্ডল আলোকিত হয় বলিয়া ঐ সকল ক্ষুদ্র তারা দেখা যায় না ; তেমনি চন্দ্রের খানিকটা ভাগের উজ্জ্বল আলোতে অন্ধকারময় ভাগটা দেখাই যায় না। তবু অমাবস্যার ২।১ দু এক দিন পরে যে কাস্তের মত সরু চাঁদ পশ্চিমদিকে উঠিতে দেখিয়াছি, তাহার উপরে অল্প আলোকিত চন্দ্রের অবশিষ্ট ভাগও দেখা যায়। ইহাতেই বুঝিতে পার যে চন্দ্রকে যে রাহুতে গ্রাস করে তাহা এই অন্ধকার বৈ আর কিছু নয়।

একটা অন্ধকার ঘরে একটী বাতি জ্বাল, ঐ বাতিটী তোমার পশ্চাতে রাখ, এবং তোমার সম্মুখে কিছু দূরে একটা বড় মাটির গোলা ধর। তাহলে ঐ গোলার সমস্ত গোল অংশটী তুমি আলোকিত দেখিবে। পূর্ণিমার দিনেও তাই হয়। সূর্য্য পশ্চিমে (অর্থাৎ পশ্চাতে) অস্ত গেল, আমাদের সম্মুখে (অর্থাৎ পূর্ব্বে) গোল হইয়া চন্দ্র উঠিতেছে। এই দিন চন্দ্রের যে ভাগ আমাদের দিকে থাকে, সূর্য্য তার সমস্তটাই আলোকিত করিতে পারে। আবার যদি তুমি ঐ গোলাটীর যে দিকে এখন আছ, ঠিক তাহার উল্টা দিক দিয়া গোলাটীর প্রতি চাও, দেখিবে যে তাহার সমস্তটা অন্ধকার হইয়া আছে ; যেদিকটাতে বাতির আলো পড়িয়াছে সেদিকের সমস্তটাই তোমার বিপরীত দিকে। অমাবস্যার রাত্রে তাই হয়। তখন পশ্চিমে সূর্য্য অস্ত যায় তাহার সঙ্গে সঙ্গেই চন্দ্র ও চলে, আবার সূর্য্য পূর্ব্বে উদয় হইবার সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রও উদয় হয়। সেদিন চন্দ্র ঠিক পৃথিবী ও সূর্য্যের মধ্যস্থলে থাকে। তাই ঐ মাটির গোলার মত চন্দ্রেরও আলোকিত অংশ আমাদের বিপরীত দিকে থাকে। তৃতীয়তঃ— ঐ বাতি তোমার পশ্চাতে রাখিয়া গোলাটীকে যদি ঠিক তোমার বাম বা দক্ষিণ (ডান) দিকে একটু দূরে রাখিয়া দাও, তবে দেখিবে যে আলোকিত অংশের অর্দ্ধেক ভাগ তুমি দেখিতেছ, তাহার আকার ঠিক অর্দ্ধচন্দ্রের মত। সপ্তমী অষ্টমী তিথিতে ঠিক এইরূপ ঘটে। ঐ দিনে যখন সূর্য্য অস্ত যায় তখন চন্দ্র মাথার উপরে থাকে ; মনে রাখিও এই তিথি অমাবস্যার পর। পূর্ণিমার পর সপ্তমীতে সূর্য্য উদয় হইবার সময়ে

* ছবি দেখ। মাঝ খানে পৃথিবী। তাহার চারিধারে চন্দ্র। পোনের দিনের ছবি দিলে অনেক গুলি হইয়া যাইত আর তোমরা ভাল বুঝিতে পারিতে না, তাই আট দিনের ছবি দেওয়া হইয়াছে। তোমরা জিজ্ঞাসা করিতে পার "দু সা'র চন্দ্র কি করিয়া হইল ?" ইহার অর্থ এই :— ভিতরের সা'রটাতে চন্দ্রের যে অংশে আলো পড়িতেছে তাহা দেখান হইয়াছে। চন্দ্রের যে দিক পৃথিবীর দিকে ফিরিয়া রহিয়াছে ঐ আলো সেই দিকের যে অংশ পর্য্যন্ত আসিয়াছে আমরা তাহাই দেখিতে পাই ; তাহার চেহারাটা কিরূপ দেখিতে হয়, বাহিরের সা'রে তাহাই আঁকা হইয়াছে। এক পাশে যে ছবিটী আঁকা হইয়াছে, তাহা সূর্য্য।

IMPERIAL LIBRARY

চন্দ্র মাথার উপর থাকে, সে দিন চন্দ্রও সূর্য্যের মধ্যে আধখানা আকাশ তফাৎ। কাজেই ঐ দিনে চন্দ্রের আকার ঐরূপ দেখা যায়। তা ছাড়া অন্য অন্য দিনেও কেরূপ কম বেশী দেখায়, আস্তে আস্তে ঐ গোলাটাকে তোমার চারিদিকে চন্দ্রের মত ঘুরাইলেই বুঝিতে পারিবে। যে পাঠক পাঠিকা সত্য সত্যই এরূপ করিয়া না দেখিবেন তিনি কখনই পরিষ্কার বুঝিতে পারিবেন না। আর পরীক্ষা দ্বারা বুঝিলে অতি সহজ হইয়া যাইবে। জ্ঞানলাভের জন্য যদি একটু কষ্ট করিতে হয় তাহাতে ভীত হওয়া কোন ক্রমেই উচিত নয়। এই টুকু বুঝিতে পারিলে ক্রমে আমরা আরও অনেক আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য বিষয় বুঝাইতে চেষ্টা করিব; যদি এ বিষয়ে কাহার কোন সন্দেহ থাকে এবং শিক্ষক বা অন্য কাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া যদি তাহা দূর না হয় তবে তিনি আমাদিগকে লিখিলে সাধ্যমত তাহার উত্তর দিব।

আখ্যান মালা।

নং ১

আরব দেশে একটী গল্প আছে যে, একদিন ভয়ানক ঝড় বৃষ্টি হইতেছে এমন সময়ে একটী উট ঝড় বৃষ্টিতে বহু কষ্ট পাইয়া একজন গৃহস্থের বাড়ীতে আশ্রয় পাইবার জন্য বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। গৃহস্বামী ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া কাজ করিতেছিলেন; উট যাইয়া বলিল—"মহাশয়! আমি সমস্ত দিন ঝড়ে ও বৃষ্টিতে কষ্ট পাইতেছি, এখন আপনি যদি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে একটু স্থান দেন তাহা হইলে বড়ই উপকৃত হই।" গৃহস্বামী উত্তর করিলেন "আমার ঘরের স্থান বড়ই সংকীর্ণ; আমার থাকিবার স্থানই নাই, কেমন করিয়া তোমার মত অত বড় জীবের স্থান আমার ঘরে দিই?" উট কাতর স্বরে বলিল "সমস্ত শরীর আমি আপনার ঘরে রাখিতে চাহি না; কেবল আমার মুখটী রাখিবার স্থান দিন?" গৃহস্বামী উটের কাতরোক্তি শুনিয়া ঘরের দরজা খুলিয়া উটের মুখ ঘরের ভিতর রাখিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। উট আবার বলিল "আমার মুখ খানি বেশ সুখে আছে কিন্তু আমার সমস্ত শরীরটা জলে ভিজিয়া অসাড় হইতেছে; যদি অনুগ্রহ করিয়া আরও একটু স্থান দেন তাহা হইলে শরীরের অর্দ্ধেকটা ঘরে রাখিয়া একটু সুখে থাকিতে পারি।" বৃদ্ধ গৃহস্বামী উটের দুঃখে গলিয়া গেলেন এবং তাহার কথায় সম্মতি দিলেন। উট ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া সমস্ত শরীরটা ঘরে রাখিবার জন্য প্রার্থনা করিল। প্রার্থনা গ্রাহ্য হইল; ছোট ঘরে দুই জনে কিছু কাল বহু কষ্টে রহিলেন। অল্পক্ষণ পরেই ঝড় বৃষ্টি থামিয়া গেল। তখন গৃহস্বামী উটকে বলিলেন—"ঝড় বৃষ্টি এখন থামিয়া গিয়াছে, দুই এক ফোঁটা বৃষ্টি হইতেছে মাত্র। এখন তুমি গৃহ হইতে বাহির হইয়া যাও, আমি আমার কাজে প্রবৃত্ত হই।" উট এই কথায় বলিল "তোমার যদি কষ্ট হয় তুমি বাহিরে যাইতে পার, আমার বাহিরে যাইবার কিছুই দরকার নাই।"

এই গল্পটী অনেক কালের, তবে ইহা হইতে যে গভীর উপদেশ পাওয়া যায় তাহার জন্যই এই

গল্পটী উল্লেখ করিলাম। ইহা হইতে এই উপদেশ পাওয়া যায় যে, দুষ্ট প্রকৃতিকে একবার অবলম্বন করিলে শেষে তাহা হইতে উদ্ধার পাওয়া যায় না। এইরূপ দেখা গিয়াছে যে, অনেক বালক একটী সামান্য মিথ্যা কথা বলা বা সামান্য দ্রব্য চুরি করাকে আদোবে অন্যায় মনে করে না; ভাবে যে ছেলে বেলায় কৃত এই দোষ বড় হইলে শুধরাইয়া যাইবে। যাহারা ছেলে বেলা হইতেই এই রূপ করে বা এইরূপ করাকে অন্যায় মনে করে না তাহারাই আস্তে আস্তে শেষে ভয়ানক দুষ্কর্ম্মে রত হয় এবং সেই অবস্থা হইতে তখন ভাল হইবার চেষ্টা করিলেও কৃতকার্য্য হইতে পারে না।

যাহা কিছু অন্যায় তাহা প্রথম হইতেই ত্যাগ করা উচিত, একবার দুষ্কার্য্যকে প্রশ্রয় দিলে শেষে তাহা হইতে উদ্ধার পাওয়া বড় সহজ নহে।

নং ২

জর্ম্মন দেশে একটী গল্প আছে যে, একদিন নদীতীরে একটী ইন্দুর কি উপায়ে সেই নদীটী পার হইতে পারে মনে মনে তাহাই ভাবিতেছিল; এমন সময়ে সেই স্থানে একটী ধূর্ত্ত ভেক আসিয়া উপস্থিত হইল। ভেক ইন্দুরকে বলিল "তুমি কি ভাবিতেছ?" ইন্দুর মনের ভাব প্রকাশ করিল। ধূর্ত্ত ভেক ইন্দুরকে পার করিয়া দিতে স্বীকৃত হইল; এবং ইন্দুরের লেজে এক দড়ি বাঁধিয়া তাহার অপর পার্শ্ব দ্বারা নিজের কোমর বাঁধিল। এই প্রকারে ইন্দুরকে বাঁধিয়া পীঠের উপর চড়াইয়া ভেক মহাশয় জলে নামিলেন এবং সাঁতার কাটিয়া যাইতে লাগিলেন। মধ্যস্থানে যাইয়া ইন্দুরকে মারিবার জন্য ভেক মহাশয় জলে ডুব দিলেন; ইন্দুর ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল এবং বলিল "কর কি? এরূপ ভাবে আমাকে মারা কি উচিত? আমি তোমাকে বিশ্বাস করিয়া তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি, এখন তোমার কি আমার প্রতি এরূপ নৃশংস ব্যবহার করা উচিত?" ভেক মহাশয় হাস্য করিয়া বলিলেন "সকল লোকই অনেক বড় বড় কথা বলে, কিন্তু কাজের বেলায় কেহই কথা রাখে না। মুখে বলিলেই যে কাজ করিতে হইবে তাহার কোন অর্থ নাই।" এই বলিয়া ধূর্ত্ত ভেক ইন্দুরকে অন্তিম কাল স্মরণ করিতে বলিল। ইন্দুর বেগতিক দেখিয়া অনন্যমনে অন্তিম কালের অপেক্ষা করিতে লাগিল।

এমন সময়ে আকাশ হইতে একটী পক্ষী ছোঁ দিয়া দুই জনকেই লইয়া গেল। পক্ষীটী ভেককে বলিল "তুমি কি করিতেছিলে? এবং তোমাকে কিসের জন্যই বা এখানে আসিতে হইল?"

ভেক কহিল "ধূর্ত্ততার জন্যই আমার এখন এরূপ দুরাবস্থা; নিরপরাধী ইন্দুরকে বধ করিয়া তামাসা দেখিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিলাম বলিয়াই এখন আমার এই দুর্দ্দশা—" পক্ষী ভেককে আর বেশী কথা বলিতে না দিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে উদরসাৎ করিয়া ফেলিল।

যে পরের সর্ব্বনাশ করিতে চেষ্টা করে তাহার সাজা ভগবান্ দেন। নির্দ্দোষী ব্যক্তিকে কখনও ক্লেশ দিওনা, অকারণে কাহারও মনে কখনও ক্লেশ দেওয়া ভয়ানক অন্যায়; যাহারা এরূপ

করে তাহারা ইহার শাস্তি নিশ্চয়ই ভোগ করিবে।

বেলুন।

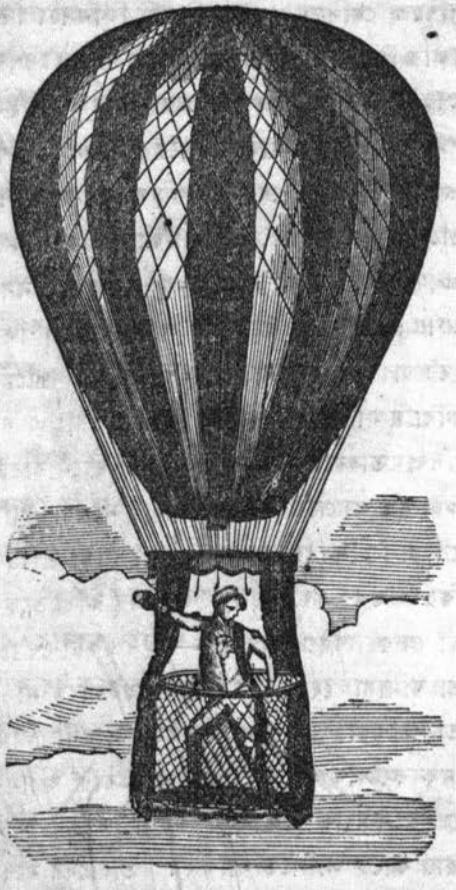

তোমাদের অনেকেই বেলুন দেখিয়াছ। আসল বেলুন না দেখিয়া থাকাই সম্ভব, কিন্তু বেলুনের নকল সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। বেলুনে চড়িয়া মানুষ আকাশে উঠে একথাও অনেকে শুনিয়া থাকিবে। অনেক সময় হয়ত তোমরা কেহ কেহ ভাবিয়াছ যে, ওরূপ একটা বেলুনে চড়িতে পারিলে না জানি কি মজাই হয়! তোমাদিগকে বেলুনে চড়াই, আমার তেমন সাধ্য নাই, কিন্তু যাহাতে তোমরা চারি পাঁচ দিন স্বপ্নে পড়িয়া বেলুনে চড়িতে পার আজ একটা পুস্তক হইতে তাহারই কিঞ্চিৎ ব্যবস্থা করা যাইতেছে।

ইউরোপে জোজেফ্ মণ্ট্‌গল্‌ফিয়র এবং ষ্টীভ্‌ন্ মণ্ট্‌গল্‌ফিয়র নামে দুই ভাই থাকিতেন, তাঁহারাই প্রথমে বেলুন উড়াইতে শিখেন। তাঁহারা দেখিলেন যে ধোঁয়া ঊর্দ্ধে উঠে। ইহাতে তাঁহারা মনে করিলেন যে, ধোঁয়াকে যদি খুব হাল্‌কা একটা থ'লের ভিতর পূরিয়া দেওয়া যায়, তবে থ'লেটাও ধোঁয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঊর্দ্ধে উঠিবে। এই মনে করিয়া তাঁহারা একটা কাপড়ের থ'লে প্রস্তুত করিলেন এবং তাহাকে একটু উচ্চ স্থানে রাখিয়া তাহার নীচে আগুন জ্বালাইয়া দিলেন। কিছুকাল পরেই বেলুনটা উঠিতে লাগিল এবং প্রায় দেড় মাইল দূরে গিয়া মাটিতে পড়িল।

মণ্ট্‌গল্‌ফিয়রদের এই অদ্ভুত কীর্ত্তির বিবরণ লোকে শুনিয়া শুনিয়া হাঁ করিয়া থাকিতে লাগিল—অনেকে বিশ্বাস করিল না। পারিস্ নগরে মস্থ চার্ল্‌স্ নামে একজন লোক থাকিতেন, তিনি কিন্তু এরূপ করিলেন না। তিনি মনে করিলেন যে শুধু ধোঁয়ার মধ্যে এমন কিছু থাকিতে পারে না যে, তাহাতে বেলুনটাকে ঠেলিয়া আকাশে তুলিতে পারে। ধোঁয়াটা যতক্ষণ খুব গরম থাকে, ততক্ষণ সেটা বাতাসের চাইতে অনেক হাল্‌কা থাকে। হাল্‌কা থাকে বলিয়াই বেলুনটাকে ঠেলিয়া তুলিতে

পারে। এই প্রকার চিন্তা করিয়া তিনি এই সিদ্ধান্ত করিলেন যে, বাতাসের চাইতে হাল্‌কা অন্য কোন জিনিস দিলেও ঐরূপ হইবে। তিনি কাপড়ের একটা বেলুন প্রস্তুত করিলেন। বেলুনের ভিতর হইতে বাতাস যেন পলাইতে না পারে, এই জন্য তাহাতে বেশ করিয়া ভাল আটা মাখাইয়া দিলেন। এই বেলুনের ভিতর জলজান বায়ু পূরিয়া তাহাকে শূন্যে উড়াইবেন সিদ্ধান্ত করিয়া তিনি পারিস্ নগরে বিজ্ঞাপন দিলেন যে, '২৭ এ আগষ্ট (১৭৮৩) আমি একটা প্রকাণ্ড গোলাকার জিনিস শূন্যে ছাড়িয়া দিব; আর সে

আপনা আপনি উর্দ্ধে চলিয়া যাইবে।' যে স্থান হইতে উড়াইবার কথা হইল, ২৭এ আগষ্ট সেখানে লোকে লোকারণ্য। যাহারা সেখানে আসিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে অতি অল্প লোকই চার্লস্ সাহেবের কথায় বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছিল। তাহারা মনে মনে স্থির করিয়া আসিয়াছিল যে পক্ষী ফড়িং ছাড়া আর কোন জিনিস আপনা হইতেই উর্দ্ধে উঠিতে পারে না। চার্লস্ সাহেবের গোলাকার জিনিসটা যখন উঠিতে না পারিয়া মাটিতে পড়িয়া যাইবে, তখন তাঁহাকে কিঞ্চিৎ উত্তম মধ্যম উপদেশ প্রদানের যুক্তিও স্থির করিয়া আসিয়াছিল। নিরূপিত সময়ের একটু পূর্ব্বেই অনেকে অধৈর্য্য প্রকাশ করিতে লাগিল। যখন ছাড়িবার সময় হইল তখন যে দড়িদ্বারা বেলুন বাঁধাছিল তাহা খুলিয়া দেওয়া হইল; আর দেখিতে দেখিতে সেই প্রকাণ্ড জিনিসটা তিন হাজার ফিটেরও বেশী উর্দ্ধে উঠিয়া গেল। দর্শকগণের মনে তখন কিরূপ ভাবের সঞ্চার হইয়াছিল, তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে। ফ্রান্স্ দেশের একটী ছোট গ্রামে বেলুনটী পড়িল। সেখানকার লোকেরা মনে করিল, এটা না জানি একটা কি? উচ্চ হইতে নীচে পড়িবার সময় সকল জিনিসই লাফায়; বেলুনটাও সেইরূপ লাফাইতে লাগিল। সহরে যে বেলুন উড়ান হইয়াছে, এ গ্রামের অধিবাসিগণ তাহা জানিত না; সুতরাং এ সব দেখিয়া তাহারা মনে করিল যে এ জানোয়ারটা একটা মস্ত পাখী বই আর কিছুই নহে। চারি ধারে গণ্ডী করিয়া লোকের সার দাঁড়াইয়াছে; বুকের ভিতর একটু একটু গুর্ গুর্ করিতেছে। ইচ্ছা আছে জানোয়ারটীকে দুই একটা খোঁচা দিয়া তামাসা দেখে, কিন্তু সাহস হইতেছে না—পাছে ঠোক্‌রায়! শেষে কয়েকজন সাহসী লোক অনেক কষ্টে কোমর বাঁধিয়া অনেক বার অগ্রসর এবং অনেকবার পশ্চাৎপদ হইয়া অল্পে অল্পে তাহার কাছে আসিতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে যে খুব সাহসী সে খোঁচা দিবার উপযোগী একটা যন্ত্র হাতে লইয়া অগ্রসর হইল। একবার এদিক একবার ওদিক হইতে সেই যোদ্ধা বিস্তর সংগ্রামকৌশল প্রদর্শন করিতে লাগিল। শেষে সাহসে

নির্ভর করিয়া প্রাণপণে জানোয়ারের গাত্রে অস্ত্রাঘাত করিল; অমনি সেটা ফোঁস ফোঁস শব্দ করিতে লাগিল, আর যে দুর্গন্ধ—গ্রামবাসীরা রণে ভঙ্গ দিল। কিছু কাল পরে জানোয়ারটা যেন খুব শুট্‌কাইয়া গেল; তখন তাহারা মনে করিল যে এবারে আঘাত সাংঘাতিক হইয়াছে। অবিলম্বে জানোয়ারকে বন্দী করতঃ গ্রামবাসী ভট্টাচার্য্য মহাশয়দের নিকট লইয়া যাওয়া হইল। তাঁহারা দেখিয়া বলিলেন ইহা এতাবৎ কাল অপরিজ্ঞাত জন্তু বিশেষের চর্ম্ম।"

প্রথম বারেই এইরূপ সুন্দর ফল লাভ করিয়া চার্ল্‌স্ সাহেবের সাহস বাড়িল। তিনি আর

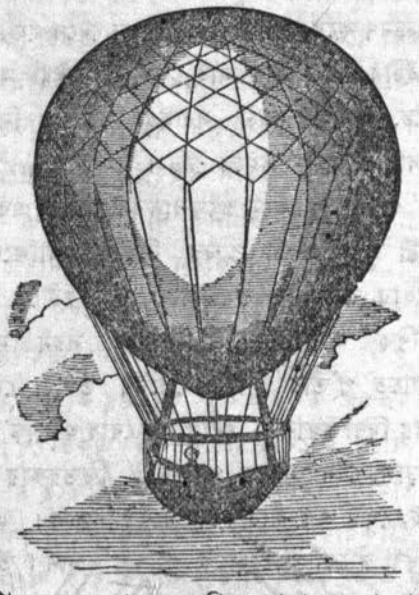

একটা বেলুন প্রস্তুত করিয়া তাহাতে আরোহণ পূর্ব্বক আকাশে উঠিতে কৃতসংকল্প হইলেন।

ক্রমশঃ।

চন্দ্রমুখীর সাজা।

একজন ভদ্রলোক জানোয়ার পুষিতে বড় ভাল বাসিতেন। তাঁহার বাড়ীতে তিন চারিটী কুকুর, একটী বানর, দুই তিনটী খরগোস, ও অনেকগুলি বিড়াল ছিল। ভদ্রলোকটীর বাড়ীতে জায়গা বড় বেশী নয়। একটী ছোট উঠানে তাঁহার পালিত পশুগুলিকে সর্ব্বদাই খেলিতে হইত; সুতরাং তাহারা সকলে এক সঙ্গে খেলা করিত। সে বাড়ীতে কেহ বেড়াইতে আসিলে, আশ্চর্য্য হইয়া বলিত; বাঃ! বানর কুকুর বিড়াল খরগোসে একত্র খেলাইতে কখনও দেখি নাই।

সকলের বড় কুকুরটীর নাম ভুলো। সে একটী প্রকাণ্ড বিলাতি কুকুর, কিন্তু বড় ভাল মানুষ। সে বেচারা তাহার সঙ্গীদের অনেক উপদ্রব সহ্য করে। বানরটী তাহাকে কখনও কখনও ঘোড়া করে, তার ঘাড়ে চড়িয়া বসে, কখনও তাহার লেজ ধরিয়া টানে, কখনও তার কাণ মলিয়া দেয়। আবার কখনও বা আদর করে। ভুলো চারি হাত পা ছড়াইয়া চক্ষু মুদিয়া পড়িয়া থাকে, আর বানরটী তার উকুন বাছিয়া দেয়; তাহার লেজটী উলটিয়া পালটিয়া পরীক্ষা করে, তাহার তল পেট চুলকাইয়া দেয়, ভুলোর তাহাতে বড় আনন্দ। বানরটীর নাম মহাবীর। ভুলো মহাবীরের প্রতি বড় কৃতজ্ঞ। সে মাঝে মাঝে ভাল ভাল খাবার জিনিস পাইলে নিজে না খাইয়া মুখে করিয়া মহাবীরকে আনিয়া দেয়। বিড়াল গুলির মধ্যে একজন গিন্নী, অন্য গুলি তার ছেলে মেয়ে। তাহারা সেই বাটীতেই জন্মিয়াছে। মহাবীর তাহাদের সকলকেই কোলে পীঠে করিয়া মানুষ

করিয়াছে। ছানাগুলি যত দিন ছোট থাকে, মহাবীর তাহাদিগকে বড় ভাল বাসে। সর্ব্বদাই একটী না একটী ছানা বগলে থাকে। ছানাগুলির এমনি অভ্যাস হয় যে, তাহার মায়ের মুখে যেমন সুখে ঝোলে, মহাবীরের বগলেও তেমনি আরামে থাকে। মধ্যে মধ্যে মহাবীর ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া দুধের ঢাকা খুলিয়া ছানাগুলিকে দুধ পান করান। দুই একবার এইরূপ ধরা পড়াতে, তাঁহার কোমরের দড়ি প্রায় খুলিয়া দেওয়া হয় না। ছানাগুলি বড় হইলে মহাবীরের আর ততটা ভাল বাসা দেখা যায় না; তখন আর দিন রাত্রি বগলে করিয়া বেড়ান না কিন্তু তাহাদের সুখ দুঃখের প্রতি দৃষ্টি থাকে। তাহারা পরস্পর কামড়া-কামড়ি করিলে মহাবীর তৎক্ষণাৎ গিয়া বিবাদ ভাঙ্গিয়া দেন।

খরগোস গুলি পথে ঘাটে লোহিত বর্ণ চক্ষু উল্টাইয়া শুইয়া থাকে; বিড়ালের ছানাগুলি তাহাদের লম্বা লম্বা কাণ লইয়া খেলা করে, তাহাতে তাহাদের বিরক্তি নাই। বিড়ালদের গিন্নীও কখনো কখনো আসিয়া খরগোস গিন্নীর কাছে শুইয়া লেজটী নাড়িয়া ছানাদিগকে খেলা দিয়া থাকেন।

কুকুরদের মধ্যে সকলের ছোট একজন আছে, তাহার নাম "পেমা"। সে কিছু লোভী। অন্য সময়ে সে বেশ খেলা করে, বেশ লাফায়, বেশ ছুটা-ছুটী করে। বিড়ালের ছানাদের মুখের কাছে খেউ খেউ করিয়া তাহাদের ছোট ছোট হাতের থাবার প্রহার খাইতে ভাল বাসে। মহাবীরের কাঠের ঘরের ছিদ্রের ভিতর মুখের অগ্রভাগ পুরিয়া দিয়া কৌতুক করে। এ সকল বেশ, কিন্তু আহারের সময় সে আর এক মূর্ত্তি ধারণ করে। যখন সে ক্ষুধাতে খেঁকি হইয়া থাকে, এবং আহার করিতে আরম্ভ করে তখন তাহার নিকট যায়, কাহার সাধ্য! দশ হাতের মধ্যে একটী পায়রা চরিতে আসিলে তাহাকে তাড়া করে। তখন কাহারও নিস্তার নাই; ছোট বড় জ্ঞান নাই; সকলকেই কামড়াইতে যায়। এই জন্য তাহাকে স্বতন্ত্র খাবার দেওয়া হয় এবং তাহার সঙ্গীদের কেহই তাহার নিকটে যায় না। বেচারা ভুলো ভাল মানুষ, সে রাক্ষসের মত তাড়াতাড়ি নাকে মুখে কতক গুলো গিলিতে পারে না। এই জন্য পেমার জ্বালায় তাহাকে কখনও কখনও আধ পেটা থাকিতে হয়। কোন কোন দিন পেমার নিজের খাবারে পেট ভরে না, সে তাড়াতাড়ি আপনার খাবার খাইয়া ফেলিয়া ভুলোর পাত্র আক্রমণ করে, ভুলো বেচারা যখন দেখে যে ছোট ভাইটীর পেট ভরে নাই, ক্ষুধার্ত্ত হইয়া আসিয়াছে, অমনি মুখটী সরাইয়া লয় ও নিজের খাবার তাহাকে খাইতে দেয়।

এইরূপ কয়জনে সুখে বাস করিতেছে, একদিন কর্ত্তা বাবু একটী সুন্দর বিড়াল আনিলেন। তাহার রূপ অতি চমৎকার। চক্ষু দুটীতে যেন মাণিক জ্বলিতেছে; লোমগুলি নরম নরম, গলাতে পুঁতীর মালা, পেটের তলাটী মেজেণ্টার দিয়া রঙ্গান। দেখিলেই বোধ হয় বড় সুখী বিড়াল, যেন ননির পুতুলটী। ভিতরকার কথা এই, সেটী এক আঁট্‌কুড়ো ঘরের বিড়াল। একটী বিধবা স্ত্রীলোক তাহাকে পুষিয়াছিলেন। তাঁহার আর কেহই ছিল না; সুতরাং দুধটুকু সরটুকু ঘরে যখন যাহা হইত সমুদায় "চন্দ্রমুখী" পাইত। ঐ বিধবা তাহাকে চন্দ্রমুখী বলিয়া ডাকিতেন। চন্দ্রমুখী সর্ব্বদাই লেপ ও বালিশের উপরে শয়ন করিয়া ঘোঁড় ঘোঁড় করিত। একটী দিনের জন্য কাদাতে পা দেয় নাই, বৃষ্টিতে ভিজে নাই। বৃষ্টি

আসিলে সে লেজটী গুটাইয়া পা দুখানি পাতিয়া ঘরের দ্বারে বসিয়া বৃষ্টি দেখিত ও মাঝে মাঝে গা, হাত, পা চাটিত, জলের ত্রিসীমায় যাইত না। চন্দ্রমুখীর রুচিটী নবাবের মত হইয়াছিল। সে ছোটলোকের মত ডাল ভাত খাইতে পারিত না, ডাঁটা নাক দিয়া শুকিতও না; হয় দুধ না হয় মাছ দিয়া ভাত খাইত, তাও মাখিয়া না দিলে তাহা স্পর্শ করিত না। বিধবা নিজে মাছ খাইতেন না, কিন্তু চন্দ্রমুখীর জন্য ভাল ভাল মাছ কিনিয়া আনিতেন; সুতরাং চন্দ্রমুখী একলা ঘরের একলা মেয়ে, সে সেই সমুদায় মাছ একলা খাইত। এই রূপে সুখে স্বচ্ছন্দে চন্দ্রমুখীর দিন যাইতেছিল, হঠাৎ বিধবাটীর গুরুতর পীড়া হইয়া মৃত্যু হইল। সুতরাং চন্দ্রমুখী পরের হাতে পড়িল। আমাদের কর্ত্তা বাবুটী বড় জানোয়ার-ভক্ত; সুতরাং ঐ বিড়ালটী যত্ন করিয়া বাড়ীতে আনিলেন। কিন্তু আনিয়া যেই উঠানে ছাড়িয়া দিলেন, ভাবিলেন ভুলো ও মহাবীরের সহিত পরিচয় করিয়া দিবেন, অমনি চন্দ্রমুখী আর এক মূর্ত্তি ধরিল। ভুলো নিকটে আসিবা মাত্র লেজ ফুলাইয়া ও গায়ের লোম খাড়া করিয়া দাঁড়াইল, পেমা নবাগত বন্ধুর সহিত কৌতুক চলিবে কিনা পরীক্ষা করিবামাত্র তাহাকে থাবা মারিল, এবং অন্য বিড়ালগুলিকে দেখিবামাত্র গর্জ্জন করিয়া বিবাদ আরম্ভ করিল। গৃহস্বামী দেখিলেন বড় বিপদ; তাঁহার শান্তির সংসারে অশান্তি আসিল। ভাবিলেন সময়ে চন্দ্রমুখী একটু ভদ্রতা শিখিবে। দুই চারিদিন তাহাকে দূরে দূরে রাখিলেন, অনেক যত্ন করিলেন, কিন্তু সে সঙ্গীদের সহিত কোন ক্রমেই মিশিতে চাহিল না। পেমা খেলানে বালক, তাহার অগম্য স্থান বাড়ীতে ছিল না। চন্দ্রমুখী কোন কোণে বা বিছানার পার্শ্বে শুইয়া আছে পেমা সেখানে আসিত; আর চন্দ্রমুখী তাহাকে থাবা মারিয়া অপমান করিয়া তাড়াইত। গৃহস্থ মধ্যে মধ্যে সকলের খেলা দেখিবার জন্য সকলকে ঘরের মধ্যে আনিতেন, তখন চন্দ্রমুখী জানালা দিয়া বাহির হইয়া যাইত এবং বাড়ীর মধ্যে একপার্শ্বে গিয়া শয়ন করিয়া থাকিত।

ক্রমে চন্দ্রমুখীর আরও অনেক বিদ্যা প্রকাশ পাইল। একটী খাঁচাতে গৃহস্থের একটী পাখী ছিল, তিনি তাহাকে স্নান করাইয়া মধ্যে মধ্যে মাটিতে রৌদ্রে বসাইয়া রাখিতেন। চন্দ্রমুখী তাহাকে ধরিবার জন্য খাঁচার উপরে ঝাঁপ দিয়া পড়িত। গৃহস্থ দেখিয়া বলিতেন—হাঁ তাইত কোন গুণ নাই, এটীত বেশ আছে! চন্দ্রমুখীর দ্বিতীয় বিদ্যা চুরি করা। সে দুধের ঢাকা খুলিয়া মধ্যে মধ্যে চুরি করিয়া দুধ খাইত।

এক দিন চন্দ্রমুখীর স্বার্থপরতার প্রতিফল ফলিল। সেই দিন গৃহস্থ খেলা করিবার জন্য ঘরের মধ্যে পশুগুলিকে আনিবামাত্র চন্দ্রমুখী জানালা দিয়া বাহির হইয়া গেল। সে দিন তাহার এত অসহ্য হইল যে, সে সে বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া অন্য এক প্রতিবেশীর বাড়ীতে যাইবে মনে করিল। কিন্তু যেই যাইবার জন্য পথে বাহির হইল অমনি তীরের বেগে এক বিলাতি কুকুর আসিয়া একেবারে তাহার ঘাড়ে কামড়াইয়া ধরিল। সে কুকুরটী নিজের প্রভুর সহিত পথ দিয়া যাইতে ছিল, সে বড় দুরন্ত। চন্দ্রমুখীর বিপদ সূচক আর্ত্তনাদ উঠিবা মাত্র ভুলো গৃহের ভিতর হইতে ছুটিয়া আসিল। কিন্তু আসিয়া যখন দেখিল চন্দ্রমুখীকে বিনাশ করিতেছে, আর যেন তাহার উৎসাহ হইল না। সে নিজে বিলাতী কুকুর, গায়ে যথেষ্ট জোর ছিল,

মনে করিলে চন্দ্রমুখীকে শত্রুমুখ হইতে উদ্ধার করিতে পারিত, কিন্তু তাহার যেন সে উৎসাহ হইল না। সে আসিয়া দেখিয়াই দূরে দাড়াইয়া রহিল ও আবার বাড়ীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। গৃহস্বামী চন্দ্রমুখীর আর্ত্তনাদ শুনিতে পান নাই; কেবল ভুলো হঠাৎ ছুটিয়া গেল কেন এই বলিয়া কারণ জানিবার জন্য দ্বারের দিকে যাইতেছিলেন, দেখিলেন ভুলো ফিরিয়াছে, তখন তিনিও ফিরিলেন। অবশেষে চাকরেরা চন্দ্রমুখীর রক্তাক্ত মৃত দেহ আনিয়া উপস্থিত করিল। গৃহস্থ বড় একটা দুঃখিত হইলেন না, বলিলেন "স্বার্থপর বিড়ালটা আচ্ছা সাজা পাইয়াছে।" চন্দ্রমুখী যে মরিল তাহাতে কাহারও এক বিন্দু কষ্ট হইল এরূপ বোধ হইল না। সকলেই বলাবলি করিতে লাগিল "আচ্ছা যে ভুলো সে দিন পেমাকে বাঁচাইবার জন্য বীরের ন্যায় যুদ্ধ করিয়াছে সে আজ কিছু বলিল না কেন?" ভুলো মনে মনে ভাবিল "যে আমাদিগকে দেখিতে পারেনা, তাহার জন্য মরিব কেন?"

এইত দেখিলে চন্দ্রমুখীর দশা। ভুলোর মৃত্যু শয্যার ছবি একবার দেখ। কিছুদিন পরে বেচারা ভুলোর কি এক প্রকার পীড়া হইল; আহার করিতে চায় না, সর্ব্বদা বমন করে, যেখানে সেখানে শুইয়া থাকে; গায়ের লোম গুলি ঝরিয়া যাইতে লাগিল; পোকার কামড়ানিতে সর্ব্বদা মাটিতে গা ঘষিত, বাড়ী শুদ্ধ সকলের অসুখ। পেমা আগে বুঝিতে পারে নাই, ভাবিয়াছিল বুঝি সুখ করিয়া শুইয়া আছে। কিন্তু শেষে যখন বুঝিল যে ভুলো পীড়িত তখন আর কাছ ছাড়ে না, সর্ব্বদা আসিয়া শুঁকিয়া থাকে। মহাবীর বড় অপ্রসন্ন। গৃহস্বামীর ত কথাই নাই, তিনি স্বয়ং স্বহস্তে সাবান দিয়া ভুলোর গা পরিষ্কার করিয়া দেন; তাঁহার কন্যাগণ পোকা বাছিয়া দেয়; তাঁহার গৃহিণী ভুলোর মুখে চুম্বন করেন, বলেন—"বাপধন! তোমার কি হয়েছে? অমন করে পড়ে আছ কেন।" যে সময়ে ভুলোর প্রাণবায়ু দেহকে পরিত্যাগ করিল, তখনকার কি ভাব! সমুদায় পশুগুলি বিষণ্ণ বদনে চারি দিকে ঘিরিয়া বসিয়াছে, গৃহস্থের চক্ষে জলধারা বহিতেছে; বাটীতে ছেলে মেয়ে মরিলে বাটীর লোক যেমন কাঁদে তেমনি গৃহস্থের পত্নী ও কন্যাগণ কাঁদিতেছেন। স্বার্থপর চন্দ্রমুখীর মরণে কেহ একটী নিশ্বাসও ফেলে নাই; আজ ভুলোর মৃত্যুতে কত লোকের চক্ষে জল পড়িতেছে।

চন্দ্রমুখী ও ভুলো, এই দুই জনের মধ্যে পাঠক পাঠিকাগণ কাহাকে অধিক ভাল বাসিলেন জানিলে সুখী হইব।

(প্রাপ্ত।)

চোর বিড়াল।

১

এক বাটী দুধ রেখে ভাঙা ডালা-তলে,
"ঘোষ পিসী" গিয়াছে কোথায়।
"সুসময়" বুঝি পুশি চুপে চুপে চলে,
উপনীত হইল তথায়।

২

এদিক ওদিক চেয়ে লোক নাহি হেরি
বিড়ালের কি আনন্দ আজ।
"জয় জনার্দ্দন!" বলি চক্ চক্ করি
আরম্ভিল আপনার কাজ!

৩

"চক্ চক্" সর গেল, আধা দুধ যায়
হায় হরি! পাপীর কপালে
সুখ ভোগ কখনই চিরস্থায়ী নয়,
তাই চারু এল হেন কালে!

৪

চারু সে "দুরন্ত ছেলে" জল খেতে এসে
দেখিল সকল পাতি আড়ি,
নিকটে আছিল লাঠি তাই লয়ে ক'সে
মারে এক দোহাতিয়া বাড়ি!

৫

"মেও মেও" করে পুশি বাটী ছেড়ে যায়
বড়ই লেগেছে গায়ে ব্যথা,
রাগ ক'রে কতবার চারু পানে চায়
হতভাগা কেন এল হেথা!

৬

ভাবে পুশি চারু গেলে বুঝিব আবার
নাহয় সহিব আর বাড়ি
কেমনে ভুলিব আহা! ও দুদের তার
কেমনে যাইব বাটী ছাড়ি?

৭

চারু বলে, চোর পুশি! কি সাহস তোর,
দিন দু পহরে কর চুরি?
আর এক বাড়ি দিয়ে ঘুচাইব জোর
চোরে আমি বড় ঘৃণা করি!

৮

শোনেনি বোঝেনি যেন, এইরূপে পুশি
মধুর করুণ গীতি গায়;
তবু চারু চলে যাবে ভেবে মহা খুসি!
তবু সেই বাটী পানে চায়!

৯

হেনকালে—যে কুকুরে চারু ভালবাসে
সেই এসে উঠানে ডাকিল
কুকুরে হেরিয়া চারু স্নেহভরে হাসে
দুদ টুকু তারে নিয়ে দিল।

১০

তখন নিরাশ চিতে বিড়াল বুঝিল
"পাপ আশা,—তাই পুরিল না!
চোর বলি চারু মোরে এতই মারিল
আর আমি চুরি করিব না।"

১১

দু একটী ছেলে আছে বিড়ালের মত
দিবা নিশি কত সাজা পায়
আপনার দোষে হায় রোগ ভোগে কত
তবু তারা চুরি ক'রে খায়।
আমারে মনের কথা চুপে চুপে কও
পাঠক পাঠিকা! ভাই তোমরা তো নও?

কেমন ছবি এঁকেছি?

রামরাম কলিকাতার সিটি স্কুলে পড়ে। পাঠকদিগের মধ্যে যাহারা সিটি স্কুলে পড় তাহারা জান যে সিটি স্কুলে চিত্র বিদ্যা (drawing) শিক্ষা

দেওয়া হয়। আমাদের গয়ারাম কখনও চিত্রের ক্লাসে যায় না, চিত্র কাহাকে বলে তাহাও জানে না; অথচ তাহার মনে মনে একটা ভারি অহঙ্কার আছে যে, সে ইচ্ছা করিলেই ভাল ছবি আঁকিতে পারে। গয়ারামের সকল দিকেই এই রকম; সে ক্লাসে বসিয়া পড়ার সময় গল্প করে, শিক্ষক পড়া জিজ্ঞাসা করিলে হাঁ করিয়া থাকে, একটী কথাও বলিতে পারে না; শিক্ষক তিরস্কার করেন, সে চুপ করিয়া শুনে। অথচ তার মনে মনে অহঙ্কার আছে যে, সে সব জানে; তবে যে শিক্ষকের নিকট প্রত্যহ সে গালি খায় সে তাহার কপালের দোষ। একদিন তাহাদের ক্লাসের নরেন্দ্র একটা ঘোড়ার ছবি আঁকিয়াছিল; ছবি খানি এত সুন্দর হইয়াছিল যে, সকলেই তাহাকে খুব প্রশংসা করিল, এমন কি শিক্ষক মহাশয় পর্য্যন্ত তাহার প্রশংসা করিলেন। এই সমস্ত দেখিয়া আমাদের গয়ারামেরও বড় সাধ হইল, সে ছবি আঁকিয়া সকলের প্রশংসা লইবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গয়ারাম কখনও ছবি আঁকে নাই, কিন্তু তাহার বিশ্বাস, সে ইচ্ছা করিলেই ছবি আঁকিতে পারে; এখন এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া সে ছবি আঁকিতে বসিল; নরেন্দ্র ঘোড়া আঁকিয়া বাহবা লইয়াছে, গয়ারামের ইচ্ছা হইল সে মানুষের ছবি আঁকিয়া আরও অধিক প্রশংসা লইবে। যে কখনও ছবি আঁকে নাই, সে যে একেবারেই মানুষ আঁকিবে তাহা কত অসম্ভব তাহা সহজেই বুঝিতে পার; কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি গয়ারামের অহঙ্কার বড় বেশী, তাই সে একেবারেই মানুষ আঁকিতে

বসিয়াছে। বাঃ! কি চমৎকার ছবিই হয়েছে! যেমন বিদ্যে, তেমনিই হয়েছে। ক্লাসের ছেলেরা ত হো হো ক'রে হেসে হাত তালি দিতে লাগিল।

আমাদের গয়ারামের বুদ্ধি একটু মোটা, সে ঠাট্টা বুঝিল না, ভাবিল বুঝি তাহারা বাহবা দিতেছে। আমাদের পাঠক পাঠিকাদের মধ্যে যদি গয়ারামের মত কেহ থাক তবে দেখিয়া শেখ। শুধু ছবি আঁকা কেন, সকল দিকেই এই রকম গয়ারাম দেখিতে পাওয়া যায়। নিজে যাহা জান না তাহার অহঙ্কার করিও না, গয়ারামের মত তোমা-

কেও দেখিয়া সকলে হাসিবে। নিজের যাহা আছে তাহা অপেক্ষা আপনাকে বড় মনে করিও না, করিলে পদে পদে ঠকিবে; প্রশংসা পাইবার জন্য কোন কাজ করিবে না, প্রশংসার আশায় কাজ করিলে তাহাতে কখনও প্রশংসা পাওয়া যায় না। তার পর ভাল ছবিই আঁকিতে চাও, আর ক্লাসের সকলের চেয়ে পড়া শুনাতেই ভাল হইতে চাও, বা খুব বড় পদ পাইয়া সকলের মান্য গণ্য হইতে চাও, দশ জনের এক জন হইতে চাও, তবে কয়েকটী কথা মনে রাখিতে হইবে। যাহাই করিতে চাও, প্রথমতঃ খুব আগ্রহ,—ঐকান্তিক ইচ্ছা থাকা দরকার; তার পর সেই কাজ করিবার নিমিত্ত যত্ন, উৎসাহ ও অধ্যবসায় থাকা দরকার। তার পর যাহা করিবে গোড়া হইতে আরম্ভ করিবে, একেবারেই গাছের ডগায় উঠা যায় না, পত্তন ভাল না হইলে কোন কাজই হয় না। তার পর আরও একটী চাই, সেটী ধৈর্য্য; ব্যস্ত হইলে কোন কাজ হয় না, ধীরে ধীরে কাজ করিতে হয়, একবারে না হইলে দশ বার চেষ্টা করিতে হয়; এইরূপে তবে লোকে বড় লোক হয়। নতুবা আমাদের গয়ারামেরও যে দশা তোমাদেরও সেই দশা হইবে।

শাক্য মুনির ক্ষমা।

শাক্য সিংহ বলিতেন, "মূর্খতা বশতঃ কেহ যদি আমার প্রতি মন্দ আচরণ করে, তৎপরিবর্ত্তে আমি তাহাকে প্রেমের শীতল আশ্রয় প্রত্যর্পণ করিব। তাহা হইতে যত অন্যায় ব্যবহার আসিবে, আমা হইতে ততই সদ্ভাব বাহির হইতে থাকিবে। এই সদনুষ্ঠানের সুঘ্রাণ আমার পক্ষে সর্ব্বদা সুফলপ্রদ, কিন্তু নিন্দুকের বিদ্বেষ বচনের মন্দ ফল তাহারই নিকট পুনর্ব্বার ফিরিয়া আইসে।"

"সদ্ভাবের দ্বারা অসদ্ভাব জয় করিতে হইবে" এই উপদেশ তাঁহার মুখে শ্রবণ করিয়া কোন দুষ্ট লোক একবার তাঁহাকে অপমান করে; তাহার অপমান করা শেষ হইলে মুনিবর দুঃখের সহিত বলিলেন, বৎস! কোন ব্যক্তি কাহাকে কোন সামগ্রী উপহার দিবার কালে যদি ভদ্রতার নিয়ম বিস্মৃত হয়, তাহা হইলে এইরূপ বলিবার রীতি আছে যে, 'তুমি ইহা ফিরাইয়া লইয়া যাও।' পুত্র, এক্ষণে তুমি আমার অবমাননা করিলে, কিন্তু আমি তোমার কুব্যবহার গ্রহণে অসম্মত হইতেছি; তোমার নিজ দুঃখের কারণ এই ব্যবহার তুমি ফিরাইয়া লও। যেমন ঢাকের সহিত শব্দ এবং বস্তুর সহিত ছায়া অবস্থিতি করে, পরিণামে দুরাচারীর পশ্চাতে তেমনি দুঃখই নিশ্চয় অনুসরণ করিবে। আকাশের দিকে চাহিয়া থুথু ফেলিলে তাহা দ্বারা স্বর্গ যেমন কলঙ্কিত হয় না, দুষ্ট লোকের নিন্দা অপমানে তেমনি সাধুর কিছু মাত্র ক্ষতি হয় না।" মুখের একটী কটু কথা সহ্য করিতে না পারিয়া কত লোক ক্রোধে পাগল মত হয়। কিন্তু শাক্যের কেমন অশ্চর্য্য ক্ষমা গুণ! তিনি জলন্ত ক্রোধানলে ক্ষমার জল ঢালিয়া দিতেন, এবং শান্তভাবে লোকের কটু বাক্য সহ্য করিতেন।

মন পরীক্ষা।

একজন লোক মনে মনে যাহা ভাবিতেছে আর একজন তাহা বলিয়া দিতে পারে; তোমরা বোধ হয় ইহা কল্পনাও করিতে পার না।

বিলাতে অনেক লোক আছেন যাঁহারা এরূপ বলিতে পারেন; সম্প্রতি একজন সাহেব এখানে আসিয়াছেন, তিনি মনের কথা বলিয়াদিতেছন। যে কোন লোক যে কোন বিষয় চিন্তা করিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হউন না কেন, তিনি তাহা বলিয়া দিতে পারেন। এ বিষয় পরীক্ষা করিবার জন্য এখানে অনেক সভা হইয়া গিয়াছে; এবং যাঁহারা মন পরীক্ষা করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছিলেন তাঁহাদের সকলেরই মনের কথা উক্ত সাহেব ঠিক বলিয়া দিয়াছিলেন। এ বড় আশ্চর্য্য ক্ষমতা! কি করিয়া এইরূপ পারা যায় আমরা তাহা বলিতে অক্ষম।

তোমাদিগকে একটী সংকেত শিখাইয়া দিতেছি; তোমাদের মধ্যে কেহ একটী অঙ্ক মনে ভাবিলে তোমরা এই সংকেত অনুসারে তাহা অনায়াসেই বলিয়া দিতে পারিবে।

মনে কর তুমি এবং নেপাল একস্থানে খেলা করিতে বসিয়াছ; তুমি নেপালকে একটী অঙ্ক ভাবিতে বল এবং সে যে অঙ্ক ভাবিবে তাহাকে ৩ দিয়া গুণ করিতে বল এবং গুণফলের সহিত ১ যোগ করিতে বল। যোগফলকে আবার তিন দিয়া গুণ করিয়া যাহা মনে মনে ভাবিয়াছে তাহা দ্বারা যোগ করিতে বল; যোগ ফল যাহা হইবে তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া লইবে এবং তুমি মনে মনে শেষের অঙ্কটি বাদ দিয়া যাহা থাকিবে তাহাই বলিয়া দিবে 'যে তুমি ইহা ভাবিয়াছ।'

দৃষ্টান্তঃ—

মনে কর নেপাল ভাবিয়াছে ১১

১১×৩ =৩৩

৩৩+১ =৩৪

৩৪×৩ =১০২

১০২+১১ =১১৩

১১৩ হইতে শেষের অঙ্কটি অর্থাৎ ৩ মনে মনে বাদ দিলেই ১১ থাকিল।

অনেক প্রকার উপায় আছে যাহা দ্বারা পরে যে অঙ্ক মনে ভাবিতেছে তুমি তাহা বলিয়া দিতে পার। একটী নিয়ম মাত্র এবারে প্রকাশিত হইল। ইহা ভিন্ন অন্য কোন নিয়ম কেহ আমাদিগকে জানাইলে আমরা তাহা প্রকাশ করিব। এবং যাঁহারা ঠিক উত্তর দিতে পারিবেন তাঁহাদের উত্তর ধাঁধার উত্তরের সহিত পরিগণিত হইবে।

ধাঁধা।

গতবারের ধাঁধার উত্তর।

১। কানন; ২। ব্রাহ্মণ ৫ জন, কায়স্থ ৮ জন ও মুসলমান ২৭ জন; ৩। ইন্দু+র=ইন্দুর; ৪। রামধনু; ৫। মৃত্যু; ৬। দস্তানা; ৭। নূতন পঞ্জিকা; ৮। গতকল্য।

নূতন।

১। বলত ৪৫ কে কিরূপ ভাবে সাজাইলে ৪৫ হইতে ৪৫ বিয়োগ করিলে ৪৫ অবশিষ্ট থাকিবে?

২। উত্তর করয় শুধু কে আছে এমন
কোন প্রশ্ন কাহাকেও না করে কখন।

মার্চ্চ, ১৮৮৬।

জোসেফ ম্যাট্‌সিনি।

সখার পাঠক পাঠিকা! যে মহাত্মার ছবি আজ তোমরা দেখিতেছ, ইনি আমাদের দেশের লোক নন। তোমরা কি ইটালী দেশের নাম শুন নাই? শুনিয়াছ বৈ কি? ভূগোলে নিশ্চয় পড়িয়াছ। যদি না পড়িয়া থাক, তবে ইহাঁর এই জীবন-চরিত পড়িবার পূর্ব্বে একবার এটলাস খানি খুলিয়া ইউরোপের ম্যাপটী দেখ। ঐ ম্যাপে ইউরোপের দক্ষিণ ভাগে তিনটী উপদ্বীপ দেখিবে, তাহার সকলের পশ্চিম ধারেরটী স্পেন ও পোর্টুগাল; মাঝেরটী ইটালী ও সকলের পূর্ব্বটী গ্রীস দেশ। এই ইটালীদেশ দেখিতে বিলাতী শিকারীর বুট জুতার ন্যায়। ইটালী দেশে অন্বেষণ করিতে করিতে টাইবার নামে এক নদী ও তাহার তীরে রোম নামে এক নগর দেখিতে পাইবে। আগে অনুসন্ধান কর, আমরা কয়েক মিনিট অপেক্ষা করিতেছি।

পাইলে কি? ঐ রোম নগর এক সময়ে ভুবন-বিজয়ী ছিল। রোমের লোকদিগকে রোমান বলিত। রোমানগণ সাহসে ও পরাক্রমে জগতের সকল জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিল। তাহাদের সাহস ও দেশ-হিতৈষিতার অনেক আশ্চর্য্য গল্প আছে, যাহা শুনিলে তোমরা অবাক হইয়া যাইবে, এবং স্বদেশকে কিরূপে ভাল বাসিতে হয় তাহা বুঝিতে পারিবে। সে সকল গল্প শুনিতে শুনিতে তোমাদের মাথার চুল দাঁড়াইয়া উঠিবে। কিন্তু এবার সে সকল গল্প করিতেছি না। মনোযোগ পূর্ব্বক যদি তোমরা 'সখা' পড়,ক্রমে সে সব শুনিতে পাইবে। যাহা হউক রোমানগণ অতিশয় সাহসী, বীর ও দেশ-হিতৈষী জাতি ছিল। তাহারা অপর জাতির দাসত্ব সহ্য করা দূরে থাকুক, নিজেদের রাজাদের দৌরাত্ম্য সহ্য করিতে না পারিয়া তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিয়াছিল। রোমে রাজা ছিল না; প্রজারাই আপনারা রাজ্য শাসন করিত। ক্রমে রোমানেরা দেশ বিদেশ জয় করিয়া জগতে বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল। তখন ইটালীর বড় সৌভাগ্যের অবস্থা ছিল। রোমের নামে জগতের সকল দেশ কাঁপিয়া যাইত। ইটালী কোন বিদেশীয় রাজার অধীন ছিল না। কিন্তু কাল ক্রমে ইটালীর সে সুখের দিন চলিয়া গেল। ইটালীবাসীগণ ধনী, সুখ-প্রিয়, পাপাসক্ত হইয়া পড়িল; তাহাদের বীরত্ব ও পরাক্রম চলিয়া গেল। অবশেষে তাঁহারা অপর জাতির অধীন হইয়া পড়িল। ইটালীর উত্তরে অষ্ট্রিয়া নামে একটী দেশ দেখিবে। ঐ দেশের লোকেরা আসিয়া ইটালীর অনেক দেশ অধিকার করিল। ইটালীর

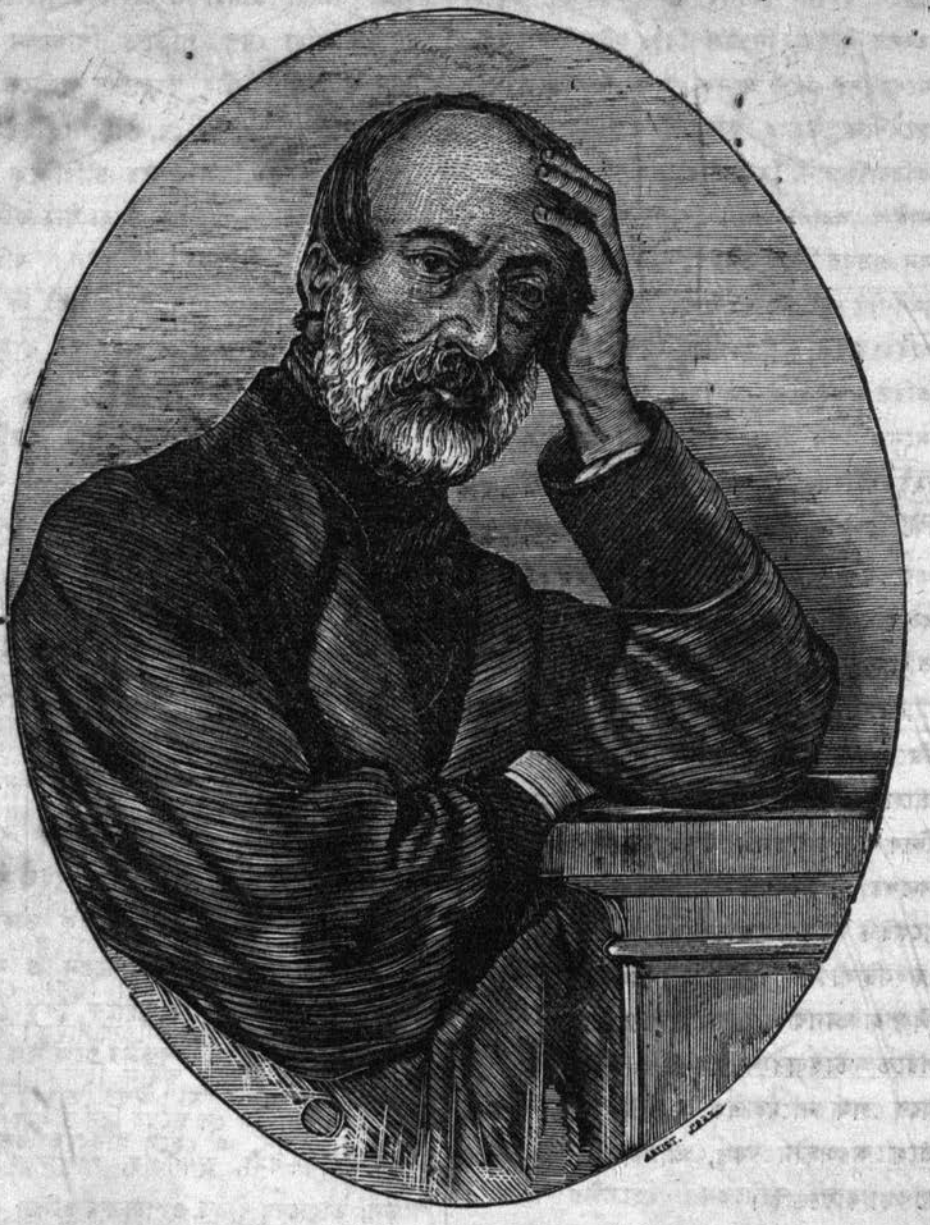

ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে যে দুই একজন দেশীয় রাজা রহিল তাহারাও নিস্তেজ, হীন-সাহস, অপদার্থ হইয়া রহিল।

এইরূপে পরাধীন হইয়া কয়েক শত বৎসর কাটিয়া যাইতে লাগিল। এখন আমাদের প্রিয় জন্ম-ভূমির যেরূপ অবস্থা, তখন ইটালীর সেইরূপ অবস্থা ছিল। পরাধীনতার অনেক ক্লেশ, সে সব ক্লেশ তোমরা বড় হইলে বুঝিতে পারিবে। সেই

ক্লেশে ইটালী দেশের লোকের মন বহু শত বৎসর ধরিয়া নিতান্ত বিষণ্ণ হইয়াছিল। মধ্যে মধ্যে সেই দেশে অনেক লোক পরাধীনতা হইতে স্বদেশকে উদ্ধার করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের সে চেষ্টা সফল হয় নাই। পরাধীনতাতে দেশের অধিকাংশ লোকের মন এতদূর নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছিল যে,ঐ সকল দেশ-হিতৈষী লোক দেশের লোকের সাহায্য না পাইয়া যুদ্ধে হারিয়া দলে দলে প্রাণ পরিত্যাগ করিত। এইরূপে জোসেফ ম্যাট্‌সিনির জন্মিবার অনেক দিন পূর্ব্ব হইতেই ইটালীদেশে স্বদেশ-হিতৈষী ব্যক্তিগণ দেশের দুর্দ্দশা দেখিয়া মনের ক্ষোভে কাল কাটাইতেছিলেন। এবং মধ্যে মধ্যে এক এক দল লোক বিদেশী রাজাদের দাসত্ব হইতে আপনাদের দেশকে উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিতে গিয়া ধনে প্রাণে নিধন প্রাপ্ত হইতেছিল।

এমন সময়ে ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে ইটালীর অন্তর্গত জিনোয়া নগরে জোসেফ ম্যাট্‌সিনির জন্ম হইল। তাঁহার পিতা ঐ নগরের একজন বিখ্যাত ডাক্তার ছিলেন। তাঁহার মাতা অতি ধীর-প্রকৃতি ও সদাশয়া রমণী ছিলেন। তাঁহার সদগুণে সকলে মোহিত হইত। সন্তানদের প্রতি তাঁহার অতিশয় স্নেহ ছিল, কিন্তু জোসেফের প্রতি তাঁহার কিছু বিশেষ ভালবাসা ছিল। শৈশবাবস্থায় জোসেফের শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল ছিল। এমন কি ৫।৬ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তিনি দাঁড়াইতে শিখেন নাই। তাঁহাকে একটা ঘেরা চৌকিতে বসাইয়া তাঁহার মাতা গৃহকর্ম্ম করিতেন। ছেলেটার শরীর বড় দুর্ব্বল বলিয়া তাঁহার পিতা তাঁহাকে কিছু দিন পড়িতে দিবেন না মনে করিয়াছিলেন, কিন্তু শিশু ম্যাট্‌সিনির পড়াতে এমন অনুরাগ ছিল যে,তিনি পিতার অজ্ঞাতসারে আপনার ভগিনীদের পড়া শুনিয়া শুনিয়া ও তাহাদের সাহায্যে অল্প দিনের মধ্যে বেশ পড়িতে শিখিলেন। এক দিন একজন আত্মীয় তাঁহাদের বাড়ীতে বেড়াইতে আসিয়া দেখেন যে, সেই পাঁচ ছয় বছরের ছেলে নিজের চৌকির উপরে চারিদিকে বই ও ম্যাপ ছড়াইয়া নিমগ্ন-চিত্তে তাহা পাঠ করিতেছে, দেখিয়া তাঁহার আশ্চর্য্য বোধ হইল। যদি সেই বালককে কেহ জিজ্ঞাসা করিতেন তুমি কি উপহার চাও,অমনি তিনি বলিতেন আমি বই চাই। বই তাঁহার এত প্রিয় ছিল।

ম্যাট্‌সিনির ছেলেবেলার আর একটী সুন্দর গল্প আছে। একদিন তাঁহার মাতা তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছেন, এমন সময়ে একটী বৃদ্ধ ভিক্ষুক দ্বারে ভিক্ষা করিতে আসিল। জননী দেখিলেন ঐ বৃদ্ধকে দেখিয়া ছেলে আর নড়ে না, কেবল হাঁ করিয়া তাকাইয়া আছে। মনে করিলেন বুঝি ছেলে তাহার পাকা দাড়ি, ছেঁড়া কাঁথা ও ভিক্ষার ঝুলি দেখিয়া ভয় পাইয়াছে। এই ভাবিয়া ফিরিয়া যেমন ম্যাট্‌সিনির হাত ধরিয়া আনিতে যাইবেন, অমনি ম্যাট্‌সিনি তাঁহার হাত ছাড়াইয়া দৌড়িয়া গিয়া ঐ বৃদ্ধের কণ্ঠ আলিঙ্গন পূর্ব্বক তাহার মুখে ঘন ঘন চুম্বন করিতে লাগিলেন ও মাতাকে বলিতে লাগিলেন,—"মা ইহাকে কিছু দেও, মা ইহাকে কিছু দেও।" বুড়টীর চক্ষে জল পড়িতে লাগিল। সে বলিল "মা! ঈশ্বর তোমার ছেলেকে বাচাইয়া রাখুন, এ ছেলে গরিবকে বড় ভাল বাসিবে।"

ক্রমে ম্যাট্‌সিনির বয়স বাড়িতে লাগিল, তাঁহার পিতা তাঁহাকে স্কুলে দিলেন। ম্যাট্‌সিনি স্কুলে পড়িবার সময় খুব মন দিয়া লেখা পড়া শিখিতে লাগিলেন। তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধি

দেখিয়া শিক্ষকগণ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইতেন। ম্যাট্‌সিনির প্রকৃতি অতি সৎ, নম্র, সাহসী, ও পরোপকারী ছিল; এই সকল গুণে তিনি সকলের প্রিয় হইলেন। ম্যাট্‌সিনি সুশিক্ষিত হইয়া কলেজ হইতে বাহির হইলেন; এবং ওকালতি করিবার জন্য চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার যেমন বয়স বাড়িল সেই সঙ্গে তাঁহার মন আর একদিকে গিয়া পড়িল। দেশের লোকের দুরবস্থা দেখিয়া তাঁহার মনে বড় ক্লেশ হইত। তিনি দেশের পরাধীনতার কথা ভাবিয়া চক্ষের জল ফেলিতেন। বিদেশীয় লোকে দেশের প্রজাদের উপর অত্যাচার করিতেছে, ইহাতে তাঁহার প্রাণে এত কষ্ট হইত যে, তিনি মনের দুঃখে ভাল কাপড় পরিতেন না, কোন আমোদ প্রমোদে যোগ দিতেন না, লোকের সঙ্গ ভাল লাগিত না, একেলা একেলা থাকিতেন এবং কিসে দেশের উদ্ধার হয় এই চিন্তা করিতেন। সেই সময়ে ইটালী দেশে যুবকদিগের এক অতি গোপনীয় সভা ছিল, তাহার সভ্যেরা স্বদেশকে পরাধীনতা হইতে উদ্ধার করিবার জন্য শপথ পূর্ব্বক দলবদ্ধ হইয়াছিলেন। 'স্বদেশের উদ্ধার জন্য যদি প্রাণ দেওয়া আবশ্যক হয় তাহাও দিব' তাঁহারা এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। ম্যাট্‌সিনি গোপনে ঐ দলের সভ্য হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতা মাতা তাহা জানিতেন না। রাজারা এইরূপ দলকে বড় ভয় করিতেন ও তাহার মধ্যে কাহাকেও ধরিতে পারিলে কঠিন শাস্তি দিতেন।

ম্যাট্‌সিনি তাঁহাদের সহিত যোগ দিয়া উৎসাহের সহিত স্বদেশের উদ্ধারের চেষ্টা করিতেছেন, এমন সময়ে হঠাৎ সেই দলের একজন বিশ্বাস-ঘাতক লোক তাঁহাকে ধরাইয়া দিল। এই ঘটনা ১৮৩০ সালে ঘটে। ম্যাট্‌সিনির বয়স তখন ২৫ বৎসর। তাঁহাকে ধরিয়া এক নির্জ্জন কারাগারে অনেক দিন কয়েদ করিয়া রাখা হইল। তাঁহার পিতা তাঁহাকে কয়েদ হইতে মুক্ত করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। তিনি জেল-খানাতে বসিয়াই দেশের উদ্ধারের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। অষ্ট্রিয়া গবর্ণমেণ্ট দেখিলেন এ ব্যক্তিকে ইটালীতে কয়েদ করিয়া রাখাতেও বিপদ আছে; সুতরাং তাঁহাকে দেশের বাহির করিয়া দিল। তিনি ফ্রান্স দেশে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। আর দেশে ফিরিয়া আসিবার যো নাই; পিতা মাতা ভাই ভগিনী কাহারও মুখ দেখিবার আশা নাই; ইটালী রাজ্যে একখানি পা বাড়াইবার হুকুম নাই। কিন্তু ফ্রান্স দেশে আসিয়াও ম্যাট্‌সিনি অলস হইলেন না। স্বদেশের উদ্ধার কিসে হইবে এই চিন্তাতে দিন রাত্রি ব্যস্ত হইলেন। তিনি যেমন স্বদেশ হইতে তাড়িত হইয়া আসিয়াছিলেন এইরূপ তাঁহার সমবয়স্ক আরও অনেকগুলি যুবক তাড়িত হইয়া সেই সময়ে ফ্রান্স দেশে বাস করিতেছিলেন। ম্যাট্‌সিনি তাহাদিগকে একত্র করিয়া "নব্য-ইটালী" নামে এক সভা স্থাপন করিলেন ও ঐ নামের একখানি খবরের কাগজ বাহির করিলেন। ঐ সভাতে প্রবেশ করিতে হইলে সভ্য দিগকে শপথপূর্ব্বক প্রাণ, মন, ধন সমুদায় দিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করিতে হইত। ম্যাট্‌সিনি সর্ব্ব প্রথমে নিজের নাম স্বাক্ষর করিয়া সভ্য হইলেন, তৎপরে আরও অনেক ব্যক্তিকে শপথ করাইয়া সভ্য করিলেন। এই সকল সংবাদ ইটালী দেশে প্রচার হইলে রাজাদের প্রাণে ভয় জন্মিল; কিন্তু দরিদ্র প্রজারা আনন্দ করিতে লাগিল। সে দেশের গবর্ণমেণ্ট চেষ্টা করিতে লাগিলেন, যাহাতে ম্যাট্‌সিনির কাগজ সে দেশে

প্রচার না হয়, কেহ না পড়িতে পায়। কিন্তু কোথা হইতে যে শত শত কাগজ বিলি হইয়া যায় কেহ ধরিতে পারে না! ঐ সকল কাগজ গোপনে গোপনে বিলি হয়, লোকে পড়ে, গবর্ণমেণ্ট কোন রূপেই বারণ করিতে পারে না। হাজার হাজার যুবক ম্যাট্‌সিনির সভার সভ্য হইতে লাগিল। তখন গবর্ণমেণ্টের মনে ভয়ের সঞ্চার হইতে লাগিল। তাঁহারা দেখিলেন ম্যাট্‌সিনি ফ্রান্স দেশে থাকিলেও নিস্তার নাই। তখন ফ্রান্স দেশের রাজা লুই ফিলিপ্‌কে এই অনুরোধ করা হইল যে, তিনি ম্যাট্‌সিনিকে ফ্রান্স দেশ হইতে তাড়াইয়া দেন। চোরে চোরে মাসতুতো ভাই, রাজায় রাজায় বন্ধুতা না রাখিলে চলে না সুতরাং ফ্রান্সের রাজা তাহাই করিলেন। ম্যাট্‌সিনি ফ্রান্সেও থাকিতে পাইলেন না! ফ্রান্স দেশ পরিত্যাগ করিয়া সুইজরল্যাণ্ড দেশে গমন করিলেন। সেখানেও তাঁহার বিশ্রাম নাই; সেখানে নানা দেশের তাড়িত লোকদিগকে একত্র করিয়া নব্য-ইউরোপ নামক আর একটী সভা করিলেন। ঐ সভাতে নানা জাতীয় লোক ছিল, সেখানেও তিনি নূতন স্বাধীনতার জলন্ত ভাব সকলের মনে প্রবিষ্ট করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অত্যাচারী গবর্ণমেণ্ট এখানেও তাঁহাকে সুখে থাকিতে দিল না। ইটালী গবর্ণমেণ্টের অনুরোধে সুইজরল্যাণ্ডের গবর্ণমেণ্টও তাঁহাকে তাড়াইয়া দিল।

এই সময় তাঁহার বড় ভয়ানক দশা উপস্থিত হইল। কষ্টে দুঃখে দুর্ভাবনায় তাঁহার শরীর মন ক্লান্ত হইয়া পড়িতে লাগিল; তিনি স্বদেশের উদ্ধারের বিষয়ে যে আশা করিতেছিলেন, সে বিষয়ে এখন সন্দেহ জন্মিতে লাগিল; তাঁহার নিতান্ত আত্মীয় বন্ধু যাঁহারা ছিল, তাঁহারাও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে লাগিল; যাহারা শপথ পূর্ব্বক তাঁহার সাহায্য করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, তাহারা অনেকে পৃষ্ঠভঙ্গ দিতে লাগিল। এই অবস্থায় ঘোর যাতনাতে তাঁহাকে দিন কাটাইতে হইয়াছিল। অবশেষে তাঁহার মনের অন্ধকার আবার সরিয়া গেল। তিনি সুইজরল্যাণ্ড দেশ হইতে তাড়িত হইয়া জগৎ বিখ্যাত ইংলণ্ডে গমন করিলেন।

ইংলণ্ডে যে তিনি কি কষ্টে দিন কাটাইতে লাগিলেন তাহার বর্ণনা হয় না। তাঁহাকে যখন স্বদেশ হইতে বাহির করিয়া দিল, তখন তাঁহার পিতা পর্য্যন্ত তাঁহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি, যদি বিদেশীয় রাজাদের নিকট একটু ঘাড় হেঁট করিতেন তাহা হইলেই স্বদেশে সুখে বাস করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা করিলেন না। এজন্য তাঁহার পিতা চটিয়া গেলেন। মনে মনে ভাবিলেন "ইটালীতে কি আর যুবক কেহ নাই; ইটালী কি তাহাদের স্বদেশ নয়, দেশের জন্য তাঁহার এত ছটফটানি কেন?" হায়! সংসারাসক্ত পিতা বুঝিতে পারিলেন না, পুত্রের প্রাণে কি আগুন জ্বলিয়াছে। তিনি ম্যাট্‌সিনির প্রতি বিরক্ত হইয়া বলিলেন "যাক্ মরুক গিয়ে, আমি তাঁহার খরচের টাকা দিব না।" এই বলিয়া খরচ পত্র বন্ধ করিলেন। সংসারে ম্যাট্‌সিনির মা না থাকিলে বিদেশে অনাহারেই তাঁহার মৃত্যু হইত। তাঁহার জননী ও ভগিনী গোপনে আপনাদের টাকা হইতে তাঁহার খরচ পত্রের মত টাকা পাঠাইতে লাগিলেন। তাঁহার পিতা তাহা জানিতেন না। এই টাকা পাঠাইবার সময় তাঁহার মাতা ও ভগিনীদিগকে অতিশয় ক্লেশে থাকিতে হইত। ওদিকে ম্যাট্‌সিনি যে টাকা পাইতেন, তাহা এক জনের মত, কিন্তু

তিনি সেই এক জনের টাকাতে তাঁহার ন্যায় আরও দুইটী তাড়িত যুবকের ব্যয় চালাইতেন। তাঁহাকে আধপেটা খাইয়া অত্যন্ত ক্লেশে থাকিতে হইত। ইংলণ্ডে তাঁহার এক এক দিন এতদূর কষ্ট হইয়াছে যে, তাঁহাকে গায়ের জামা ও পায়ের জুতা পর্য্যন্ত বন্ধক দিতে হইয়াছে। ইহাতেও তিনি একদিনের জন্য দমিয়া যান নাই; একটী দিনের তরেও স্বদেশের উদ্ধারের চিন্তা করিতে ভুলেন নাই। তিনি ভাবিয়াছিলেন, ইংলণ্ডে গিয়া তিনি নিরাপদে বাস করিতে পারিবেন, কিন্তু তাহাও হইল না। তাঁহার দেশের গবর্ণমেণ্টের অনুরোধে ইংলণ্ডের গবর্ণমেণ্ট ডাকঘর হইতে তাঁহার চিঠি পত্র খুলিয়া পড়িতেন ও ইটালীর গবর্ণমেণ্টকে সেই সংবাদ দিতেন। ওদিকে ইটালীতে তাঁহার বন্ধু বান্ধবের প্রতি ঘোরতর অত্যাচার আরম্ভ হইল।

(ক্রমশঃ।)

জোয়ার ভাঁটা।

অনেক পাঠক পাঠিকা কলিকাতার নিকটে অথবা অন্য কোন স্থানে গঙ্গাতীরে বাস করেন। তাঁহারা নিশ্চয়ই দেখিয়াছেন যে, প্রতিদিন দুইবার করিয়া গঙ্গার জল বাড়ে ও কমে; লোকে ইহাকে জোয়ার ভাঁটা বলে। এখন জিজ্ঞাসা করি এই যে, রোজ দুবার করিয়া গঙ্গার জল বাড়ে ও কমে কেন? স্নান করিবার সময়ে হয়ত কত দিন ভাঁটার সময় কাঁদার উপর দিয়া অনেক দূর গেলে তবে জল পাওয়া যায়, আর কতদিন অমনি একেবারে গঙ্গার কানে কানে জল থৈ থৈ করিতেছে দেখিয়া বড় আনন্দ হয়; তাহার কারণ তোমরা কখন কি জানিবার চেষ্টা করিয়াছ? পাঠক পাঠিকাদিগকে আমরা একটী অনুরোধ করিতেছি। যাঁহার সম্মুখে যে বিষয় আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হইবে, তিনি যদি কাহার নিকট তাহার কারণ জানিতে না পারেন, তবে যেন আমাদিগকে লিখেন, আমরা উপযুক্তমত তাহার উত্তর দিতে চেষ্টা করিব।

এখন আমরা জোয়ার ভাঁটা কেন হয়, তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিব। যাঁহাদের বাড়ী ত্রিবেনীর উত্তর, তাঁহারা গঙ্গার জোয়ারের জল বড় দেখিতে পান না; সেখানে গঙ্গার জল কেবল সাগরের দিকেই চলিতে থাকে, ভাঁটার জলের মত সে সকল স্থানের জল কেবল দক্ষিণ মুখে চলে। আর যত দক্ষিণ দিকে আসা যায়, গঙ্গাতে ততই জোয়ারের তেজ দেখা যায়। তাহার অর্থ বুঝা কঠিন নয়। জোয়ার যে কেবল ভাগীরথীতেই দেখা যায় তা মনে করিও না। গঙ্গা, মেঘনা, সিন্ধু, গোদাবরী, কাবেরী, কৃষ্ণা, মহানদী প্রভৃতি যত নদী ভারতবর্ষে আছে এবং তা ছাড়া সমস্ত পৃথিবীর যত নদীর কথা ভূগোলে পড়িয়াছ, তাহাদের প্রায় সমস্ত গুলিতেই জোয়ার হয়। কিন্তু কেবল সাগরের নিকট কিয়ৎ দূর পর্য্যন্ত জোয়ারের জোর চলে, তার পর নদী সকল

একটানা। সুতরাং বুঝিতেই পারিতেছ যে গঙ্গা ও অন্যান্য সব নদীর জোয়ার সাগরের উপর নির্ভর করে। নদী সকল সাগরে পড়ে, এজন্য যতক্ষণ সাগরের জল নদীর মুখ অপেক্ষা নীচু, ততক্ষণ নদীর জল সাগরেই পড়িবে। কিন্তু যদি কোন কারণে সাগরের জল নদীর জল অপেক্ষা উচ্চ হইয়া উঠে, তাহা হইলে সাগরের জল নদীর মধ্যে প্রবেশ না করিয়া থাকিতে পারেনা। তখন নদীর জলের গতি ফিরিয়া যায়। এতক্ষণ যে জল সাগরের দিকে যাইতেছিল, তাহা এখন বিপরীত দিকে চলিবে। এই বিপরীত প্রবাহের নামই নদীর জোয়ার।

এখন বুঝিলে যে সাগরের জলে জোয়ার হওয়ায় জল ফুলিয়া উঠে এবং ঐ উচ্চ জল নদীর মধ্যে প্রবেশ করিলেই নদীতে জোয়ার হয়। কাজেই এখন এই প্রশ্ন মনে উঠিবে—যে সাগরে জোয়ার কেন হয়? আমরা এইবার তাহার উত্তর দিব।

সমুদ্রই পৃথিবীর অধিক ভাগ ব্যাপিয়া আছে। সমস্ত পৃথিবীকে চারি ভাগ করিলে, প্রায় তাহার তিন ভাগ জলে ঢাকা, আর এক ভাগের কিছু বেশী স্থল দেখা যাইবে (ওয়ার্ল্ডের ম্যাপ দেখ।) এই সমুদ্রভাগ যে কত গভীর তাহার এখনও সকল স্থানে ঠিকানাই হয় নাই। হিমালয় পর্ব্বত যে এত উচ্চ, তাহার মত পর্ব্বত ও সাগরের মধ্যে লুকাইয়া থাকিতে পারে এবং তাহার উপরে ও অনেক জল থাকে। এই অতল অকূল জলরাশি পৃথিবীর গায়ে লাগিয়া রহিয়াছে কেন?—সকলেই জান যে পৃথিবী নিজ আকর্ষণ শক্তি দ্বারা উহাকে টানিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছে। মনে কর যদি আর একটা প্রকাণ্ড গ্রহ পৃথিবীর নিকটে আসিয়া জলটাকে টানিত, তাহা হইলে ঐ জল আর স্থির থাকিতে পারিত না। এখন দেখ পৃথিবী এই রূপে জলে আবৃত হইয়া আছে, আর আকাশের সমস্ত গ্রহ ও উপগ্রহ, সূর্য্য ও নক্ষত্রাদি সকলেই জলস্থলময় পৃথিবীকে আকর্ষণ করিতেছে। সহজেই বুঝিতে পারিতেছ যে চন্দ্র সর্ব্বাপেক্ষা অধিক নিকটে বলিয়া উহার আকর্ষণই খুব বেশী হইবে। সূর্য্যটা একটা অতি প্রকাণ্ড জিনিস, সুতরাং সে দূরে থাকিলেও চন্দ্রের পরেই তাহার আকর্ষণ। নক্ষত্র সকল এত দূরে আছে যে মনে ধারণা করাই যায় না। সুতরাং কেবল চন্দ্র সূর্য্যের আকর্ষণই অনুভব করা যায়। পৃথিবীর যে সমস্ত অংশ স্থলময় তথায় কোন পরিবর্ত্তন দেখা যায় না; কেননা স্থল কঠিন। কিন্তু যে সকল ভাগ সাগরে আবৃত, তথায় এই আকর্ষণের কার্য্য বেশ দেখা যায়। যখন যে সাগরের উপর এই আকর্ষণ কার্য্য করে, অর্থাৎ যাহার উপর সূর্য্য বা চন্দ্র উদিত থাকে, তথাকার জল তরল বলিয়া ঐ টানের জোরে একটু উপরদিকে ফুলিয়া উঠে। এই ফুলিয়া উঠার নাম জোয়ার হওয়া। কোন কঠিন পদার্থের এক দিক ধরিয়া টানিলে সেই সঙ্গে তাহার সমস্তটাই আসে; কিন্তু তরল জিনিসের যেখানটা টানা যায় সেখান হইতেই খানিকটা সরিয়া আসে। জোয়ার হওয়ারও কারণ সেইরূপ। পৃথিবীর জল ও স্থল উভয়ই আকৃষ্ট হয়। স্থল কঠিন বলিয়া তাহাতে কোন পরিবর্ত্তন দেখা যায় না, যেমন ছিল তেমনি থাকিয়া যায়; কিন্তু সমুদ্রের অগাধ জল ত সেরূপ কঠিন নহে, কাজেই সূর্য্য বা চন্দ্র আকর্ষণ করিলে খানিক পরিমাণে সেই দিকে উচু হইয়া উঠে, তাই সেখানে তখন জোয়ার হয়।

যখন যে সাগরের ঠিক উপরে সূর্য্য ও চন্দ্র

উদয় হয়, তখন তথায় জোয়ার হয়, বুঝিলে। আবার সেই সঙ্গে একই সময়ে, ঠিক তাহার বিপরীত দিকে যে সাগর, সেখানে ও জোয়ার হয়। তাহার কারণ বুঝা তত সহজ নয়। তবু মন দিয়া শুন। আকর্ষণের একটা নিয়ম আছে জান, তাহার দ্বারা যে বস্তু যত দূরে থাকে তাহার প্রতি আকর্ষণ ও তত কম হয়। এখন, পৃথিবী যে কেমন প্রকাণ্ড তা তোমরা জান। এই প্রকাণ্ড পৃথিবীর এক দিক ও তাহার বিপরীত দিকের মধ্যে যে দূরত্ব তাহার নাম উহার ব্যাস। মনে কর কলিকাতা হইতে যদি একটা পাৎকুয়া খুঁড়িয়া যাওয়া যায় তবে ক্রমে উহা পৃথিবীর মধ্যস্থল ভেদ করিয়া উহার অপরদিকে গিয়া বাহির হইবে। পৃথিবীর এই ব্যাস প্রায় ৮০০০ আট হাজার ক্রোশ; সুতরাং ইহা সহজেই বুঝিতে পারিবে যে, একটা জিনিসকে চন্দ্র সূর্য্য কলিকাতায় যত জোরে আকর্ষণ করে, পৃথিবীর অপরদিকে কলিকাতার বিপরীত ভাগে থাকিলে সে বস্তুকে আর তত জোরে আকর্ষণ করিতে পারেনা।

ভাল। এখন দেখ, যখন চন্দ্র সূর্য্য আটলাণ্টিক মহাসাগরের কোন স্থানে উদয় হইয়াছে ও তথায় জোয়ার দেখা যাইতেছে, তখন ঠিক তাহার বিপরীত দিকের সাগরে যে জল আছে, সে জলকে কখনই আটলাণ্টিক মহাসাগরের জলের মত জোরে আকর্ষণ করিতে পারে না, নিশ্চয়ই কম জোরে টানিবে, কেননা উহা ৮০০০ ক্রোশ দূরে আছে। আটলাণ্টিক মহাসাগরের জলের অপেক্ষা পৃথিবীর কেন্দ্রে আকর্ষণের বল কম, আবার কেন্দ্রের অপেক্ষাও আটলাণ্টিকের বিপরীত দিকের সাগরের জলকে কম জোরে টানিতেছে। কাজে কাজেই, কম টান পাওয়ায় ঐখানকার জল পৃথিবীর গা হইতে একটু ঝুলিয়া পড়িবে অর্থাৎ চন্দ্র সূর্য্য যেদিকে আছে তাহার উল্টাদিকে ফুলিয়া উঠিবে। এই ফুলিয়া উঠা আর কিছুই নয়, ঐস্থানের সমুদ্রের জোয়ার। এইরূপে আমরা দেখিলাম যে একই সময়ে দুই স্থানে জোয়ার হয়।

বিষয়টী এত কঠিন যে ছবি না দেখিলে ভাল বুঝিতে পারিবে না। ছবিতে—(ক) সূর্য্য বা চন্দ্র। প—পৃথিবীর কেন্দ্র। (পৃথবী যেন চারি দিকেই সমুদ্রে বেষ্টিত) স-ফ-স-ব—সমুদ্রের উপরিভাগ।

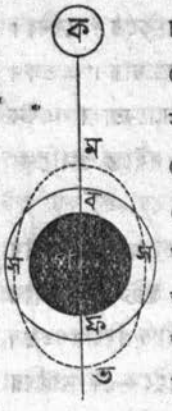

তোমরা সকলেই 'সখা'তে আকর্ষণের বিষয় পড়িয়াছ। একটী নিয়ম আছে যে, যে বস্তু যত দূরে থাকে তাহার প্রতি অন্য বস্তুর আকর্ষণ তত কম হয়। আর যে বস্তু যত নিকটে থাকে তাহার আকর্ষণ তত বেশী হয়। এখানে দেখিতেছ যে ব নামক স্থানটী প অপেক্ষা সূর্য্য বা চন্দ্রের অধিক নিকটে। ফ নামক স্থানটী আবার প অপেক্ষাও অধিক দূরে। সুতরাং সূর্য্য বা চন্দ্রের স্থানটীকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলে আকর্ষণ করিতেছে, প কে তাহাঅপেক্ষা কম আকর্ষণ করিতেছে, ফ কে আরও কম। বেশ্; এখন তোমরা দেখিতে পাইতেছ যে ফ, ব, দুইটী স্থান, তাহার ঠিক মধ্যস্থলে প আছে। ব হইতে প যত দূরে, প হইতে ফ ঠিক তত দূরে। ক ব কে টানিল, ব একটু অগ্রসর হইল; প কে ক একটু কম জোরে টানিল, সুতরাং প ব এর সমান অগ্রসর হইতে পারিল না; সুতরাং পূর্ব্বে প ও ব এর মধ্যে যে ব্যবধান টুকু ছিল, এখন তাহা একটু বাড়িল! এইরূপে প ও ফ এর মধ্যস্থিত দূরত্বটা ও ক এর আকর্ষণে বাড়িবে। সুতরাং ক আসিয়া প ফ ব কে টানিয়া এই করিল যে ইহা-

দের দূরত্ব একটু বাড়িল। প পৃথিবীর কেন্দ্র। পৃথিবীটা কঠিন জিনিস কি না, সুতরাং কেন্দ্র যে দিকে নড়িল, সমস্ত পৃথিবীই সেই দিকে নড়িল। ইহাতেই বুঝিতে পারিতেছ যে, ব যদি কেন্দ্র হইতে বেশী দূরে আসিয়া থাকে, তবে ভূপৃষ্ঠ হইতে প বেশী দূরে আসিয়াছে। সেইরূপ, ফ হইতে ভূপৃষ্ঠ একটু সরিয়া গিয়াছে। ইহার ফল এই হইয়াছে যে, এই দুই স্থানে সমুদ্রের গভীরতা বাড়িয়াছে—অর্থাৎ জোয়ার হইয়াছে।

কিন্তু এই যে দুই স্থানে জোয়ারের জল উচ্চ হইয়া উঠিতেছে, এজল কোথা হইতে আসিল? ছবি দেখিয়াই বুঝিতে পারিতেছ যে, ঐ ফুট ফুট আকারের গোল রেখাটীই তখনকার জলের সীমা রেখা। অর্থাৎ স স নামক যে দুইটী স্থান চন্দ্র বা সূর্য্যের ঠিক নীচেও নয় বিপরীত দিকেও নয়, সেই দুই পাশের দুটী স্থান হইতে জল সরিয়া আসিয়া ম ও ভ নামক স্থান দুইটীর জোয়ারের জল যোগাইয়াছে। তজ্জন্য স স নামক ঐ দুই পাশের জল খুব কমিয়া গিয়াছে অর্থাৎ ঐ দুই স্থানে ভাঁটা পড়িয়াছে।

আজ আমরা এই টুকু বুঝিতে পারিলাম যে, চন্দ্র সূর্য্যের আকর্ষণই জোয়ার ভাঁটার কারণ। এবং এক সময়ে দুই স্থানে জোয়ার ও দুই স্থানে ভাঁটা হইয়া থাকে। তাহার পর আজিকার শেষ কথা এই যে, পৃথিবী প্রায় ২৪ ঘণ্টায় একবার আপনি ঘুরে, এজন্য উহার প্রত্যেক স্থান এক দিবসের মধ্যে একবার চন্দ্র ও সূর্য্যের দিকে ফিরে; সুতরাং পৃথিবীর সর্ব্বত্রই, সকল মহাসাগরেই প্রতি দিনে দুই বার জোয়ার ও দুই বার ভাঁটা হইয়া থাকে। আরও অনেক কথা আছে, সে সমুদয় পরবারে আবার বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

বেলুন।

বাতাসের চাইতে হাল্‌কা জিনিস ভিতরে পূরিয়া দেওয়াতেই বেলুন উপরে উঠে, এই কথা তোমরা পূর্ব্বেই শিখিয়াছ। এখন তোমাদিগকে আরো কতগুলি কথা বলিব।

মনে কর অনেক দূর উঠিয়া বেলুন আর উঠিতে চাহিতেছে না। তখন যদি তোমার আরো উঠিতে ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে কি করিবে? তাহার সঙ্কেত বলি, শুন। বেলুনে চড়িবার পূর্ব্বে কয়েক বস্তা বালি বেলুনে তুলিয়া দিতে হয়। বেলুন যখন আর উঠে না, তখন এর একটী বস্তা খুলিয়া কিঞ্চিৎ বালি ফেলিয়া দিতে হয়। তাহা হইলেই বেলুন একটু হাল্‌কা হইল, এখন আর কিছু দূর নিরাপদে উঠিবে। এইরূপে যখন বালির বস্তা ফুরাইয়া যাইবে, তখন তোমার নামিয়া আসার যোগাড় দেখাই ভাল। অনেক সময় কোন সমুদ্রের উপর আসিয়া বেলুন পড়িয়া যাইবার যোগাড় করে। সমুদ্রে পড়িলে কি হয়, তা ত জানই; সুতরাং তখন বাধ্য হইয়া উপরের লিখিত উপায় অবলম্বন করিতে হয়। কখন কখন আবার ইহাতেও কুলায় না, তখন একটা দুইটী করিয়া সঙ্গের জিনিস পত্র পর্য্যন্ত ফেলিয়া দিতে হয়। তাহাতেও যদি না কুলাইল তবেই বিপদ।

আচ্ছা, মনে কর এমন হইল যে, বেলুন এত উপরে উঠিয়াছে যে তুমি তাহাতে সুবিধা মনে কর না; তখন যদি আর উঠিতে ইচ্ছা না হয়, কিম্বা যদি নামিয়া আসিতে ইচ্ছা হয় তখন কি করিবে? তখনকার জন্য দুই প্রকারের ব্যবস্থা আছে। ১ম—বেলুনের গায় একটা ছিদ্র করিয়া

দিতে পারিলেই ভিতরের হাল্‌কা জিনিসটা বাহির হইয়া যাইবে, তখন বেলুনটাকে বাধ্য হইয়া নামিতে হইবে। অনেক সময় বেলুনটাকে উপরে রাখিয়াই নিজে নামিবার যোগাড় করিতে হয়। তাহার জন্য দ্বিতীয় উপায়টী উত্তম।

দ্বিতীয় উপায়।—কাপড়ের একটা মস্ত ছাতা কর। ছাতাটা শুধু কাপড়ের হইবে, তাহাতে শিক্ বাঁট দিতে হইবে না। ছাতার মাঝখানটায় একটা গোল ছিদ্র রাখ—ছিদ্রটা যেন খুব বড় হয়। তার পর ছাতার চারিধারে লম্বা দড়ি বাঁধিয়া সমস্ত গুলি দড়ির মাথা একত্র করিয়া বাঁধ। যেখানে দড়ির মাথা গুলি বাঁধিয়াছ, সুবিধা হইলে সেখানে

বসিবার কোন রূপ উপায় কর। এই যন্ত্রটীও বেলুনে তুলিয়া লইতে হয়। নামিতে ইচ্ছা হইলে যেখানে বসিবার উপায় করিলে, সেই স্থানটা অবলম্বন করিয়া বেলুনের সহিত ছাতার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া দিতে হয়। বাতাসে ছাতাটা আপনা আপনি ফুলিয়া উঠে। তখন ধুপ্ করিয়া পড়িয়া যাইবার আশঙ্কা থাকে না।

ছাতার মাঝখানে ঐ ছিদ্রটী না থাকিলে ছাতা ভয়ানক দুলিত, ও তোমার পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা হইত। ঐ ছিদ্রটী থাকাতে দেখা গিয়াছে যে, ঐরূপ দুলিবার কোন ভয় থাকে না। (বল দেখি কেন এরূপ হয়?)

অনেকেই মনে করিতে পারেন যে, লোকে কেবল মাত্র আমোদের জন্যই বেলুনে উঠে। অনেকে আমোদের জন্য বেলুনে উঠে বটে, কিন্তু তা ছাড়া বেলুনে উঠাতে অনেক উপকার হয়; বড় ছবিটী দেখিলেই ইহা বুঝিতে পারিবে। ঐ ছবিতে যে দুইজন লোক বসিয়া আছেন, তাঁহাদের একজন গ্লেশার আর একজন কক্স্ওয়েল সাহেব। ইঁহারা ইংলণ্ডের দুইজন বৈজ্ঞানিক। পৃথিবী হইতে কত ঊর্দ্ধে বাতাসের অবস্থা কিরূপ, জানিবার জন্য ইঁহারা বেলুনে চড়িয়াছেন। গ্লেশার সাহেবের সম্মুখে বাতাস পরীক্ষা করিবার উপযোগী যন্ত্র গুলি সাজান রহিয়াছে। একটী যন্ত্রের সাহায্যে জানা যায় যে "এত" ঊর্দ্ধে উঠা হইয়াছে। অন্য একটী যন্ত্র বলিয়া দিতেছে যে সেখানকার বাতাসে "এত" জলীয়বাষ্প আছে। আর একটী বলিতেছে যে সেখানকার বাতাস "এত" গরম—ইত্যাদি।

আমরা একস্থানে বলিয়াছি যে "বেলুন এত উপরে উঠিয়াছে যে তুমি তাহা সুবিধা মনে কর না।" ইহার অর্থ হয়ত অনেকেরই বুঝিতে একটু গোল হইয়াছে, সুতরাং অত্যন্ত উচ্চে উঠিলে যে যে অসুবিধা হয়, তাহার দু একটীর উল্লেখ করা যাইতেছে। কিছু উপরে উঠিলেই দেখিবে শ্বাস ফেলিতে একটু কষ্ট হয়—বাতাস যেন কমিয়া গিয়াছে। এই অসুবিধাটা ক্রমেই বাড়িতে থাকে। এর চাইতে আরো উপরে উঠিলে দেখিবে তোমার গায়ের চামড়া ফাটিয়া যাইতেছে। আরো উপরে উঠিলে তোমার নাকের লোমকূপ গুলি দিয়া বিন্দু বিন্দু রক্ত বাহির হইবে। তাই বলিতেছিলাম অধিক উপরে উঠিলে অসুবিধা হইবে।

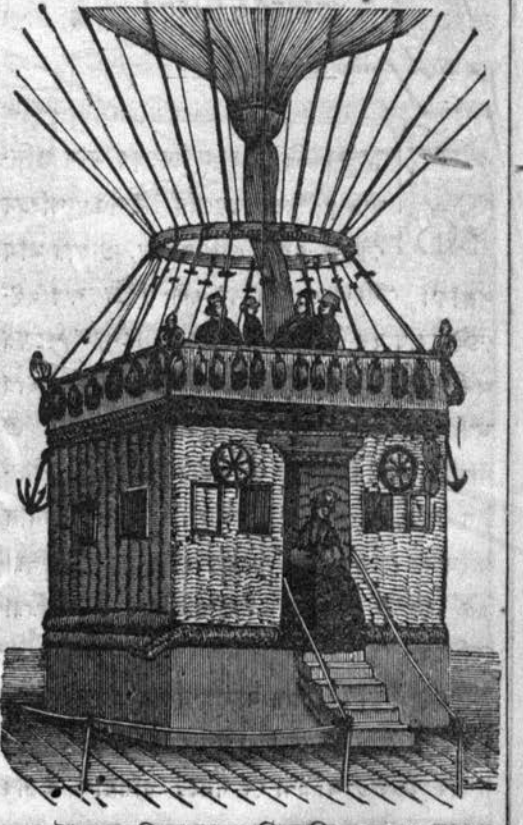

একটা গল্প বলিয়া শেষ করিতেছি। নেডার নামক এক সাহেব খুব যোগাড় যন্ত্র করিয়া একটা প্রকাণ্ড বেলুন প্রস্তুত করিলেন। (ছবি দেখ,) তাহার ভিতরে

কত কিছু ব্যাপারেরই আয়োজন হইল; সাহেব মনে করিলেন গরু হারাইল ইহার ভিতর তাহাও পাওয়া যাইবে। সকলে শসব্যস্ত হইয়া তামাসা দেখিতে আসিল; মনে করিল "এটা যখন শূন্যে উঠিবে তখন না জানি একটা কি ব্যাপারই হয়।" "বহ্বারম্ভে লঘু ক্রিয়া", বেলুনটা কত দূর উঠিয়াই পড়িয়া গেল। যাহারা তামাসা দেখিতে গিয়াছিল তাহারা বাড়ী আসিয়া হাসিতে লাগিল।

গুরু-দরবার।

তোমরা কি পঞ্জাব দেশের নাম শুনিয়াছ? ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম কোণে একটী দেশ আছে, তাহার নাম পঞ্জাব। "পঞ্চ" ও "আপ" এই দুইটী শব্দ হইতেই বোধ হয় ঐ শব্দটী হইয়াছে। "পঞ্চ" শব্দের অর্থ পাঁচ ও "আপ" শব্দের অর্থ জল। ইহার অর্থ এই এদেশে পাঁচটী নদী প্রবাহিত। ঐ পাঁচটী নদী সিন্ধু নামক নদীর শাখা। ঐ পাঁচটীর নাম, বেয়া, শৎলেজ্, রাবী, চেনাব ও ঝেলম। তোমরা ভারতবর্ষের ম্যাপ খুলিয়া এই দেশটী ও ঐ নদীগুলি ভাল করিয়া দেখিবে।

এই পঞ্জাব দেশে নানক নামে একজন মহাপুরুষ জন্মিয়াছিলেন। আমাদের দেশে নবদ্বীপ নগরে চৈতন্য জন্মিয়া যে সময়ে হরিনাম প্রচার করেন, প্রায় তাঁহার সম সম কালে, অর্থাৎ এখন হইতে তিন চারিশত বৎসর পূর্ব্বে নানকের জন্ম হয়। নানক একজন সামান্য লোকের ছেলে ছিলেন। অতি বালক কাল হইতে তাঁহার পিতা তাঁহাকে ব্যবসায় বাণিজ্যে নিযুক্ত করিয়া দেন। কিন্তু ব্যবসাবাণিজ্য তাঁহার ভাল লাগিত না, তিনি কেবল ধর্ম্ম বিষয়ে চিন্তা করিতেন; এবং ধর্ম্ম বিষয়ে দেশের লোকের দুর্দ্দশা দেখিয়া শোক করিতেন। অবশেষে তিনি বিষয় কার্য্য ছাড়িয়া কেবল গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে ধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। তিনি সকলকে এই কথা বলিতে লাগিলেন যে, একমাত্র পবিত্র স্বরূপ পরমেশ্বরকে তোমরা প্রীতি কর, সকল পৌত্তলিকতা ও কুসংস্কার ছাড়। ক্রমে নানকের অনেক শিষ্য জুটিল। ঐ শিষ্যদের নাম এখন শিখ। শিষ্য শব্দ হইতেই শিখ শব্দ হইয়াছে। নানক এই শিখদিগের প্রথম গুরু। তাঁহার পর আরও নয় জন গুরু পর পর জন্মিয়াছেন। এই শিখগণ অতিশয় সাহসী। আগে ইহারা কেবল ধর্ম্ম প্রচারই করিত, অতি শান্ত স্বভাব ছিল; কিন্তু মুসলমান রাজাদের দৌরাত্ম্যে ইহারা সুস্থির হইতে পারিত না। মুসলমান রাজারা ইহাদের গুরুদিগকে ধরিয়া অপমান করিত; এবং কাহাকে কাহাকেও প্রাণে হত্যা করিয়াছিল। সেই জন্য ইহাদের একজন গুরু ইহাদিগকে অস্ত্র শস্ত্র ধরিয়া আত্ম-রক্ষা করিতে হুকুম করেন। তদনুসারে শিখগণ সাহসী বীর ও যুদ্ধ-প্রিয় জাতি হইয়া পড়িল। ক্রমে পঞ্জাব দেশ শিখেরই রাজ্য হইল। ৪০।৫০ বৎসর পূর্ব্বে ইংরাজেরা যখন পঞ্জাব দেশ জয় করিবার চেষ্টা করেন, তখন রণজিৎ সিংহ নামে একজন শিখরাজা পঞ্জাবে রাজত্ব করিতেন। তিনি বিক্রমে বাস্তবিক সিংহের সমান ছিলেন। ইংরাজেরা ভারতবর্ষের আর সর্ব্বত্র অনায়াসে জয় করিতে পারিয়াছেন, কিন্তু পঞ্জাব দেশ জয়

করিতে নাকের জলে চোখের জলে হইতে হইয়াছিল। শিখদিগের বিক্রমে ইংরাজদিগকে অস্থির হইতে হইয়াছিল। যাহা হউক অবশেষে শিখগণ হারিয়া গেল ও পঞ্জাবদেশ ইংরাজের রাজত্ব হইল। পাঠক পাঠিকা! তোমরা যদি শিখদের ইতিহাস হাতে পাও, পড়িয়া দেখিও তাঁহাদের বীরত্ব দেখিয়া মনে আনন্দ হইবে। যাহা হউক এই শিখ জাতির সবিশেষ বিবরণ বলা অদ্য আমাদের উদ্দেশ্য নয়। ইহাদের প্রধান ধর্ম্ম-মন্দিরের বর্ণনা করাই উদ্দেশ্য।

পঞ্জাব দেশে যে সকল বড় বড় সহর আছে, তাহার মধ্যে অমৃতসহর নামে একটী বড় সহর আছে। ম্যাপে ঐ সহরটী দেখিবে। পঞ্জাবের সহরগুলি আমাদের দেশের সহরগুলির মত নহে। এই যে কলিকাতা সহর, ইহার চারিদিক খোলা; অর্থাৎ সকল দিক্ দিয়া ইহার মধ্যে প্রবেশ করা যায়। পঞ্জাবের বড় বড় সহরগুলি এইরূপ নয়। সমুদয় সহরটী প্রাচীরের দ্বারা বেষ্টিত, এবং সহরে প্রবেশের জন্য কতকগুলি "গেট" আছে; তাহাকে সংস্কৃতে তোরণদ্বার বলে। সে দ্বার গুলি বন্ধ করিবার উপায় আছে। গেট গুলি যদি বন্ধ করা যায়, তাহা হইলে সমুদয় সহরটী যেন একটী কোন বড় পরিবারের প্রাচীর বেষ্টিত বাড়ীর ন্যায় হইয়া পড়ে। পূর্ব্বকালে শত্রুকুলের আক্রমণের ভয়ে, নগর গুলিকে এইরূপ প্রাচীর বেষ্টিত করা হইয়াছিল। ইহাতে একটী প্রধান অনিষ্ট হইয়াছে। কালক্রমে সহরের লোক সংখ্যা যত বাড়িয়াছে সকলকে ঐ সহরের ভিতরেই ঠেলাঠেলি করিয়া, মাথা গুঁজিয়া থাকিতে হইয়াছে। স্থানের অত্যন্ত অপ্রতুল হওয়াতে বাড়ীর উপর বাড়ী, তার উপর বাড়ী, এই করিতে করিতে রাস্তাগুলি বড় সংকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে; এমন কি অনেক রাস্তাতে একখানি পাল্কী যাইবারও যো নাই। সুতরাং সহরের মধ্যে বাতাস পাওয়া দুষ্কর, ও সহরগুলি অত্যন্ত অপরিষ্কার হইয়াছে। এই কারণে এই সকল সহরে ওলাউঠা প্রভৃতি জন্মিয়া মধ্যে মধ্যে অনেক লোক মারা যায়। পরিষ্কার বায়ু যে স্থানে যাইতে পারে না, সে স্থান ত্বরায় অস্বাস্থ্যকর হয়। পঞ্জাবের সহর গুলিতে তাহা দেখা যায়।

যাহা হউক অমৃতসহর এইরূপ একটী সহর। কিন্তু অমৃতসহরের একটী গুণ আছে, ইহা প্রাচীরের দ্বারা বেষ্টিত হইলেও ইহার রাস্তা গুলি প্রকাণ্ড এবং সহরের জল বায়ু অতি চমৎকার। অমৃতসহরের জলের এমনি গুণ যে আমরা প্রাতে সেখানে গিয়া বৈকালে বুঝিতে পারিলাম যে নূতন স্থানে আসিয়াছি; শরীরে এত স্ফূর্ত্তি বোধ হইতে লাগিল। এই অমৃতসহর নগর যে জন্য প্রসিদ্ধ তাহা এখন বর্ণনা করিব। এই অমৃতসহরে শিখদের আদিগুরু নানক অনেক সময় থাকিতেন, তখন ইহা এত বড় সহর ছিল না। সামান্য স্থান ছিল। এই নগরে একটী উদ্যান ও একটী সরোবর আছে, তাহার নাম অমৃত-সর; সেই সরোবরের নামে এই সহরের নাম হইয়াছে। ঐ সরোবরের মধ্যস্থলে পাষাণ নির্ম্মিত একটী মন্দির আছে। তাহার উপরিভাগ সুবর্ণের পাত দিয়া মোড়া। এই জন্য ইহাকে স্বর্ণ-মন্দির বলে। পাষাণ নির্ম্মিত একটী সেতু অর্থাৎ পুল আছে, যাহা দিয়া ঐ মন্দিরে যাইতে হয়। সেই পুলটী দিয়া মন্দিরের নিকটে গেলে, দেখা যায় যে, যে সকল মার্বেল প্রস্তর দ্বারা সেতুটী ও মন্দিরটী নির্ম্মিত, তাহার অধিকাংশে অতি উৎকৃষ্ট কাজ। অনুসন্ধান করিলেই জানা যায় যে, মুসলমানদিগের সমাধিমন্দির ও ধর্ম্ম-

মন্দির হইতে হরণ করিয়া আনিয়া ঐ মন্দিরে বসান হইয়াছে। এক সময়ে মুসলমান রাজাগণ যেমন হিন্দুদের দেব-মন্দির ভাঙ্গিয়া মস্‌জিদ প্রস্তুত করিয়াছিলেন, মহারাজা রণজিৎসিংহ মুসলমানদিগের মন্দির ভাঙ্গিয়া তাহার প্রস্তর হরণ করিয়া অমৃতসহরের মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তাহার প্রতিশোধ দিয়াছেন।

যাহা হউক এই স্বর্ণ-মন্দির, এই সরোবর ও ইহার সংলগ্ন উদ্যান—এই সকলকে পঞ্জাবীরা গুরু-দরবার বলে। অর্থাৎ ইহা গুরু নানকের দরবার, বসিবার স্থান ছিল। ইহা শিখদিগের একটী প্রধান তীর্থ-স্থান। এই স্বর্ণ-মন্দিরে গুরুদিগের রচিত সংগীতের এক খানি পুস্তক আছে, সেই পুস্তককে শিখেরা দেবতার ন্যায় পূজা করে। তাহার ভোগ দেয় ও আরতি করে; তাহাকে চামর দিয়া বাতাস দেয়। এই গুরু-দরবারে ৩৬৫ দিন ২৪ ঘণ্টা উৎসব চলিতেছে। কি প্রাতে, কি সায়ংকালে, কি দিবা দ্বি প্রহরে, যখন যাও

লোকের ভিড়। সেখানে সমস্ত দিন কেবল ধর্ম্মের চর্চ্চা। সমস্ত দিন গান চলিতেছে; নানক গানের দ্বারা ধর্ম্ম প্রচার করিতেন; এই জন্য শিখগণ অত্যন্ত সংগীত-প্রিয়। গুরু-দরবারে সমস্ত দিন গান চলিতেছে। একদল গায়ক উঠিয়া যাইতেছে, আর এক দল আসিতেছে, সংগীতের আর বিরাম নাই। বৈকালে সেখানে এক অপূর্ব্ব শোভা হয়। কোথাও একজন লোক দাঁড়াইয়া ধর্ম্ম কথা বলিতেছে, দশজন দাঁড়াইয়া শুনিতেছে; কোথাও একটী স্ত্রীলোক একখানি গ্রন্থ খুলিয়া পড়িতেছে, দশজন বসিয়া শুনিতেছে; কোথাও তিনজন সুগায়ক উপবেশন করিয়া ভক্তিরসপূর্ণ গান সকল গাইতেছে, দলে দলে লোক স্তব্ধ হইয়া শুনিতেছে; কোথাও বা একজন বৃদ্ধ বসিয়া আপনার মনে বীণা বাজাইয়া ঈশ্বরের নাম করিতেছে, তাহার শ্বেত বর্ণ দাড়ি বহিয়া চক্ষের জল পড়িতেছে, অনেক গুলি পুরুষ ও স্ত্রীলোক মুগ্ধ হইয়া তাহা দেখিতেছে; কোথাও বা একজন ব্রাহ্মণ শাস্ত্র পাঠ করিয়া ব্যাখ্যা করিতেছে; এইরূপে প্রতিদিন বৈকালে সেই বাগানটীতে কেবল ধর্ম্মের চর্চ্চা চলিয়া থাকে। আর কোন কথা নাই। ছোট বড়, পুরুষ স্ত্রীলোক ভেদ নাই। সকলেরই ধর্ম্ম বিষয় বলিবার অধিকার আছে। যাহার যে মত, প্রচার কর নিষেধ নাই; শুনিয়াছি কেবল মুসলমান ও খ্রীষ্টান ধর্ম্ম প্রচার করিতে নিষেধ আছে। নতুবা আর যাহার যাহা ইচ্ছা, প্রচার কর। সকলেই কাণ পাতিয়া শুনিবে। শিখেরা এক দিকে যেমন সাহসী আর একদিকে তেমনি বিনীত। তুমি দুইটী ধর্ম্মের কথা বল, তোমার পায়ের জুতা বহিয়া দিবে ও ভৃত্যের ন্যায় সেবা করিবে। গুরুদরবারের বাগানে বেড়াইতেছ, অমনি হয় ত দেখিবে একজন দীর্ঘকায় বীর পুরুষ একখানা পাখা হস্তে আসিয়া তোমাকে বাতাস করিতেছে, কেহ বা তোমাকে মসলা উপহার দিতেছে। গুরু-দরবার এইরূপ স্থান। পাঠক পাঠিকা! তোমরা যদি বড় হইয়া কখনও দেশ ভ্রমণ কর, তাহা হইলে অমৃতসহরে গিয়া এই গুরু-দরবার দেখিও, ইহা দেখিবার উপযুক্ত স্থান।

আশ্চর্য্য কর্ত্তব্য পরায়ণতা।

বালক বালিকাদের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য পরিশ্রম সহকারে অধ্যয়ন করা একটী কর্ত্তব্য কর্ম্ম, মিথ্যা কথা না বলা, পরস্পরের সহিত সদ্ব্যবহার করা, পিতা মাতা গুরু জনের আদেশ প্রতিপালন করা, তাহাদিগের প্রতি ভক্তি প্রকাশ করাও কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

তোমার নিকট যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হইবে, তাহা সম্পন্ন করিতে তোমার প্রাণপণে চেষ্টা করা উচিত। যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিবে তাহা করিতেই হইবে। কর্ত্তব্য কর্ম্ম প্রতিপালন করিবার জন্য যে সামান্য লোকে প্রাণ পর্য্যন্তও সমর্পণ করে, তাহার একটী দৃষ্টান্ত নিম্নে দিতেছি।

"অনেক বৎসর গত হইল ইংলণ্ডের অন্তঃপাতি চেতহাম (Chiethain) নামক গ্রামের নয় মাইল

দূরবর্ত্তী কোন এক স্থান হইতে ট্যালবার্ট নামক একজন অল্প বয়স্ক ইংরাজ যুবক ডাক আনয়ন করিত। শীত কালে ইউরোপের অনেক স্থান বড়ই ভয়ানক, জলাশয়, পুষ্করিণী, নদনদী সকলের জল জমিয়া বরফ হইয়া যায়, মেঘ হইতে যে সকল জল পড়ে তাহাও পড়িতে পড়িতে জমিয়া যায়, তুষার সকল বাতাসে উড়িয়া বেড়ায়। এই শীত কালেরএক দিন রাত্রে যখন সমস্ত স্থান বরফে আবৃত, তখন সেই বালক অশ্বে আরোহণ করিয়া ডাক লইবার জন্য উপস্থিত হইল। পোষ্ট মাষ্টার তাহাকে দেখিয়া বলিলেন;—"এই প্রকার দুর্দ্দিন আমরা শীঘ্র দেখি নাই—আমার মতে তোমার ইহার মধ্যে যাওয়া সঙ্গত নহে।" ট্যালবার্ট উত্তর করিল;—"ইহার মধ্য দিয়া না গেলে কল্য প্রাতে চেতহামের লোকেরা কি প্রকারে চিঠি পত্র পাইবে?" পোষ্টমাষ্টারের বারণ না শুনিয়া ট্যালবার্ট চিঠির ব্যাগ তাহার নিকট হইতে লইয়া পিঠের উপর ঝুলাইয়া দিল; এবং অশ্বারোহণ করিয়া চলিয়া গেল। এক মাইল দুই মাইল যতই যাইতে লাগিল ততই শীতে জড়ীভূত হইতে লাগিল।

এদিকে চেতহামে কয়েকজন লোক ট্যালবার্টের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছেন; আকাশ একটু পরিষ্কার হইয়াছে,চাঁদ অল্প অল্প দেখা যাইতেছে। এক জন বলিলেন,

"ট্যালবার্ট বোধ হয় আসিবে না"

"সম্ভবতঃ না; কয়টা বাজিয়াছে, আসিবার সময় কি অতীত হইয়াছে?" আর এক জন বলিলেন, "আসিলে শীঘ্রই পৌঁছিবে।"

এই প্রকার কথা বার্ত্তা চলিতেছে এমন সময় অশ্ব প্রবেশ করিল; পোষ্ট মাষ্টার ট্যালবার্টের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন "এই প্রকারেই স্বীয় কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে হয়। তোমার ব্যাগ দাও এবং ভিতরে আসিয়া গরমহও। কিন্তু কোনই উত্তর পাইলেন না। আবার ডাকিলেন কোনও উত্তর পাইলেন না।

অবশেষে দেখা গেল যে যুবক পথেই শীতে মরিয়াছে। পরের সুবিধার জন্য সে প্রাণত্যাগ করিল।

উপরোক্ত গল্পটী ইংরাজী একখানি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। আমাদের দেশে এইরূপ কোন ঘটনা সামান্য লোকের দ্বারা সম্পাদিত হইলে বোধ হয় কেহই কোন সংবাদ লইতেন না।

ভ্রম-সংশোধন।

গতবারের সখায় ১৮ পৃষ্ঠা, ২য় স্তম্ভে, ২৮ পংক্তিতে "পৃথিবীর যেমন বার্ষিক" স্থানে "পৃথিবীর যেমন দুই প্রকার গতি আছে, বার্ষিক গতির দ্বারা এক বৎসরে উহা সূর্য্যের চারিদিকে প্রদক্ষিণ করিয়া আসে এবং আহ্নিক" পড়িতে হইবে।

ধাঁধা।

গতবারের ধাঁধার উত্তর।

১। ৯+৮+৭+৬+৫+৪+৩+২+১=৪৫
১+২+৩+৪+৫+৬+৭+৮+৯=৪৫
৮+৬+৪+১+৯+৭+৫+৩+২=৪৫

২। প্রতিধ্বনি।

নূতন।

১। বলত এমন প্রাণী কি আছে যে, প্রাতঃকালে চারিপায়ে, দুই প্রহরের সময়ে দুই পায়ে এবং সন্ধ্যাকালে তিন পায়ে হাঁটে?

স্থানাভাব বশতঃ মন পরীক্ষার কৌশল এবারে দেওয়া গেল না, অন্যবারে দেওয়া যাইবে।

এপ্রিল, ১৮৮৬।

জোসেফ ম্যাট্‌সিনি।

ম্যাট্‌সিনি ইংলণ্ডে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন, তোমরা গত বারে এই পর্য্যন্ত শুনিয়াছ। ইংলণ্ডে তিনি ১৮৪১ সাল হইতে ১৮৪৮ সাল পর্য্যন্ত ছিলেন। এই ৭ বৎসর তিনি কি চুপ করিয়াছিলেন? আপনার দেশের প্রতি যার এতদূর ভাল বাসা সে ব্যক্তি কি চুপ করিয়া থাকিতে পারে? স্বদেশে তাঁহার ন্যায় যে সকল স্বদেশ-হিতৈষী যুবক পড়িয়াছিলেন তিনি গোপনে তাহাদিগকে চিঠি পত্র লিখিয়া সর্ব্বদা পরামর্শ দিতেন। তাহা ছাড়া তিনি আর একটি কাজ করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে লণ্ডন নগরে অনেকগুলি গরিব ইটালীয় কারিকর বাস করিত। তাহারা সমস্ত দিন খাটিয়া খাইত। তাহাদের মধ্যে অনেকের বয়স অল্প, লেখা পড়া না জানাতে, ও সর্ব্বদা কুসঙ্গে থাকাতে, তাহাদের স্বভাবচরিত্র বড় মন্দ হইয়া যাইতেছিল, ম্যাট্‌সিনি স্বদেশের লোককে বড় ভাল বাসিতেন, তাই তাহাদের অবস্থা দেখিয়া তাঁহার প্রাণে বড় দুঃখ হইল। তিনি তাহাদের জন্য একটী স্কুল খুলিলেন। ঐ স্কুল রাত্রিকালে বসিত। সেখানে তিনি ও তাঁহার কয়েকজন বন্ধু বিনা বেতনে তাহাদিগকে পড়াইতে লাগিলেন। যাহারা কিছু জানিত না তাহারা লেখা পড়া শিখিতে লাগিল, যাহারা কুসঙ্গে বেড়াইয়া নষ্ট হইয়া যাইতেছিল, তাহারা ভাল কথা শুনিয়া ও ভাল বাসা পাইয়া শুধ্‌রাইয়া যাইতে লাগিল। এইরূপে সাত বৎসরে অনেক গরিব লোককে মানুষের মত করিয়া দিলেন। জ্ঞান লাভ করিয়া তাহাদের এত আনন্দ হইল যে, তাহাদের অনেকে স্বদেশে ফিরিয়া গিয়া এইরূপ গরিবদের জন্য অনেক স্থানে স্কুল করিল।

আগুন যেমন ধোঁয়াইতে ধোঁয়াইতে দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে, তেমনি ইটালীর যুবকদিগের মনে যে স্বদেশ-হিতৈষিতার আগুন এত দিন ধোঁয়াইতেছিল, তাহা ১৮৪৮ সালে দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল! এক স্থানের অনেক গুলি লোক স্বদেশকে পরাধীনতা হইতে উদ্ধার করিবার জন্য প্রথমে ক্ষেপিয়া উঠিল। এই খবর যত দূর যায় তত দূর দলে দলে লোক ক্ষেপিয়া উঠে। ভদ্র লোকের ছেলেরা সকল কাজ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া দলে দলে স্বদেশ রক্ষার জন্য সৈন্য দলে প্রবেশ করিতে লাগিল। তখন অষ্ট্রীয়া দেশবাসীগণ ইটালীর রাজা ছিলেন। তাঁহাদের রাজত্ব রক্ষা করা ভার হইল। ইটালীয় যুবকেরা তাঁহাদিগকে তাড়াইয়া লইয়া চলিল। কিন্তু এই জয়ের সুখ বেশী দিন থাকিল না। মিলান দেশের